তাহাবা এই শেষোক্ত ব্যক্তিদিগেব সুখস্বচ্ছন্দ বিধান কবিতে পারে—সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিলে বুদ্ধিমানেরা নিশ্চিন্ত হইয়া সমাজেব উন্নতি কল্পে স্বীয় স্বীয বুদ্ধি বৃত্তি নিযোজিত কবিতে পাবেন। যাহাতে বুদ্ধিমানেবা অসুবিধা ভোগ না কবেন,যাহাতে বলবানেব বল বৃথা কাজে ব্যয না হয, তাহাবই জন্যে প্রথমে "দাস শ্রেণীব" সৃষ্টি হইল। সমাজে যাহাবা দুর্ব্বল প্রথমতঃ তাহাবাই দাস শ্রেণী ভুক্ত ছিল। ক্রমে বিজিতদিগকেও সেই দলেই ভুক্ত কবা হইল। ইহাব পব অন্যান্য শ্রেণী হওযা অতিশয সহজ। তাই ক্রমে ক্রমে অন্যান্য শ্রেণী সৃষ্ট হইল। তৎপবে সেই শ্রেণী গুলি কি প্রকাবে জাতিতে পবিণত হইতে পাবে, তাহা প্রস্তাবান্তবে বলিবাব ইচ্ছা রহিল।

শ্রীমোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

বিলাত প্রত্যাগত বাঙ্গালী।

সময়ের গতি এক বিচিত্র ব্যাপাব! কাহাব সাধ্য উহার বৈচিত্র্য বুঝিয়া উঠে? যাহা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নাই, তাহা সময়েব অদ্ভুত আবর্ত্তনে আপনিই আসিযা আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। যাহা আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের নিকট স্বপ্নবৎ অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত, আজ তাহা আমাদের সুখে জীবন্তভাবে, প্রকৃত ঘটনায় পরিণত। আর যাহা আমরা এখন সুদূরে অস্পষ্টভাবে দেখিতেছি, তাহাই কালে আমাদের সন্তান সন্ততির নিকট সাক্ষাৎভাবে আসিয়া দাঁড়াইবে। তাই বলিতেছিলাম, সময়েব আবর্ত্তন এক মহা বিস্ময়জনক কাণ্ড। ২৫ কি ৩০ বৎসর পূর্ব্বে কোন

বঙ্গবাসীকে বারাণসী তীর্থ দর্শনে যাইতে হইলে এক মহা কাণ্ড উপস্থিত হইত। স্ত্রী পুত্রের রোদন-রোল, মাতার কাতরোক্তি শুনিতে শুনিতে আর প্রতিবেশীদের বিষণ্ণ মুখ দেখিতে দেখিতে তীর্থ-যাত্রীকে বিদায় লইতে হইত, যেন তীর্থ-যাত্রী এ সংসার হইতে চির বিদায় লইতেছেন, যেন তাঁহার এ সংসারের লীলা শীঘ্রই শেষ হইবে। সেই এক দৃশ্য। আর বর্তমান সময়ে কি দেখিতেছি? আজ সেই বাঙ্গালী গগন-বিহারী পক্ষীর ন্যায় স্বাধীনভাবে যথায় ইচ্ছা তথায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। এখন আর সেই হৃদয়ভেদী রোদনধ্বনি নাই, সেই অশ্রুজল নাই, বিদায়ের সেই ভাব নাই। ভারতবর্ষের কথা ছাড়িয়া দাও। আজ বাঙ্গালী সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া য়ুরোপের নানা স্থানে এবং বহু দূরবর্তী আমেরিকায় যাইয়া নানা বিভাগে নানা বিষয় শিক্ষা লাভ করতঃ ভারতের জ্ঞান গৌরব দেখাইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছে। সভ্যতাভিমানী য়ুরোপ ও মার্কিনবাসী ইহাদের মানসিক শক্তি দেখিয়া বিস্মিত। বিলাতে শিক্ষা প্রাপ্ত বাঙ্গালীর সংখ্যা কম নয়। ইঁহাদের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালীদের বর্তমান অবস্থা তাঁহাদের কর্তব্য, তাঁহাদের প্রতি সাধারণ বাঙ্গালীগণের কিরূপ ভ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা এবং কোন কোন গুরুতর বিষয়ে কো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষীর কর্তব্য। এই লক্ষ লইয়া আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি।

যতই বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালীর সংখ্যা বাড়িতেছে, ততই আমর. দেখিতেছি যে, "বিলাত-প্রত্যাগত" বলিয়া একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী গঠিত হইতেছে। ইহা যে নিতান্ত দুঃখের বিষয়, তাহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। একেইত ভারতবাসী নানা জাতি, নানা সম্প্রদায়, নানা বর্ণে বিভক্ত এবং এই নানা বিভাগই যে জাতীয় পতনের একটী প্রধা কারণ, এ বিষয়ে কে দ্বিরুক্তি করিবে? কোথায় আমরা এই না সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া এক করিব, তাহা না করিয়া আমরা নিত্য নূতন শ্রে সৃষ্টি করিতেছি! ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে যদি আশা করিয়া থাক যে,ভারতবর্ষে বর্তমান সময়ে যে বর্ণ ভেদ রহিয়াছে সেই অস্বাভাবিক জাতি-ভেদ রক্ষা করিয়াও জাতীয় উত্থান সাধি হইবে, সকল প্রকার সামাজিক কুসংস্কার পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখিয়াও এই

পতিত দেশের অভ্যুত্থান হইবে, তবে হে সমাজ-তত্ত্বানভিজ্ঞ, তোমার সেই আশাএখনি পরিত্যাগ কর। আর শূন্যে প্রাসাদ নিম্মাণে কি ফল? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পঞ্জাব দেশীয় কোন ইঙ্গ ভারতীয় সংবাদ পত্রে কি লিখিয়াছিল, একবার মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। লিখিয়াছিল—"ভারত বাসীদের মধ্যে বংশপরম্পরাগত যে সকল কুসংস্কারও মিলনের প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, তাহা যদি আমরা (ইংরেজ) শিক্ষা দ্বারা ভাঙ্গিয়া দিই, যদি এই বিংশতি কোটী মানব সম্মিলিত হয়, কাহার সাধ্য আর ইহাদিগকে শাসন করে, অতএব তাহাদিগকে এই ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যেন এই কুসংস্কার, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, বর্ণে বর্ণে প্রভেদ সম্পূর্ণরূপ থাকিয়া যায়।" এখন কুসংস্কারের পক্ষপাতীদিগের চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইতে চাই যে, আমাদের জাতীয় পতনের মূল কোথায়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও যদি আমাদের চৈতন্যোদয় না হয়, জানি না তবে কিসে মাদের এই মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবে। বলিতেছিলাম যে, একেই আমাদের দে. নানা সম্প্রদায় বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহার মধ্যে যদি উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত বিলাতপ্রত্যাগত বাঙ্গালীগণের আর একটী পৃথক শ্রেণী ষ্টি হয়, তাহা হইলে আর এ দেশের দুর্দ্দশার অবধি থাকিবে না। যাঁহারা এত দিন স্বাধীন দেশে থাকিয়া, স্বাধীন বায়ু সেবন করিয়া, স্বাধীন লোকের মধ্যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন—যাঁহারা সভ্যতর সমাজের সহিত মিশিয়া অনেক সদ্ভাব, সদাশা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা যেরূপ আমাদের জাতীয় দোষগুলি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবেন, যাঁহারা চিরকাল এ দেশেই কাটাইতেছেন তাঁহারা কখনও তদ্রূপ পারিবেন না। সুতরাং বিলাতপ্রত্যাগত স্বদেশীয়দিগের নিকট হইতে আমরা অনেক আশা করিয়া থাকি। কিন্তু তাঁহারা যদি দেশে আসিয়া স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করেন, কখনো আশা করিতে পারি না যে, তাঁহাদের দ্বারা এ দেশের কোন বিশেষ উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য এই, "বিলাতপ্রত্যাগত" বলিয়া যে একটা নূতন শ্রেণী গঠিত হইতেছে, ইহার জন্য কে দায়ী, কে প্রকৃত দোষী? আমাদের মতে প্রধান দোষী আমাদের অনুদার কুসংস্কারাবিষ্ট সমাজ। বিলাতপ্রত্যাগতদিগকে সমাজে গ্রহণ করা উচিত কি অনুচিত, হিন্দু সমাজে এই প্রশ্ন অনেক দিন হইল উত্থিত হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন

সন্তোষজনক মীমাংসায় কেহ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়াছে। আমাদের পণ্ডিতগণ অনেকবার শাস্ত্রের বিধি ব্যবস্থা দর্শাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিনা প্রায়শ্চিত্তে সমাজে গ্রহণ করা উচিত নয়। এইরূপে যে কত দিন চলিবে, কে বলিতে পারে? যে পর্য্যন্ত এই সকল গুরুতর প্রশ্ন মীমাংসার ভার স্বার্থপর বিকৃত শাস্ত্রব্যবসায়ী, অর্থ ও পসার লোভী, হৃদয় বিহীন পণ্ডিতগণের উপর অর্পিত হইবে, যত দিন পর্য্যন্ত সমাজ ইহাদিগকে নেতা বলিয়া মান্য করিবে, তত দিন পর্য্যন্ত এই প্রশ্নের প্রকৃত মীমাংসা হইবে না। দেশ রসাতলে যাইতেছে, তাহাতে তাহাদের কি আসে যায়? দেশের উন্নতি অধোগতির ধার তাহারা ধারে না, অর্থ পাইলেই হইল। যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের পণ্ডিত সমাজ বলিবে, "প্রায়শ্চিত্ত না করিলে সমাজে প্রবেশাধিকার পাইবে না," ততদিন পর্য্যন্ত বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালীও বলিবেন, "তোমার এমন সমাজ চাই না। কোন পাপ করি নাই যে, প্রায়শ্চিত্ত করিব। বিশ্বাস করি না যে, ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ দান করিলে কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। স্বাধীন দেশে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, কাহারো অনুরোধে স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন দিব না।" সমাজ যখন তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিল না, তখন ইহাঁরা কোথায় যান। হয় অন্য কোন সমাজে যাইয়া আশ্রয় লইবেন, নতুবা তাঁহারা আপনারাই এক নূতন সমাজ সংগঠন করিবেন। মানব সামাজিক জীব, সমাজ ছাড়া থাকিতে পারে না। এখন পাঠকগণ দেখুন যে, "বিলাতপ্রত্যাগত বাঙ্গালীগণ'' যে একটী নূতন শ্রেণীতে পরিণত হইতেছেন, ইহার জন্য কে দায়ী। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোক দিগের মধ্যেও এমন অনেক আছেন, যাঁহারা ইহাঁদের উপরে বড়ই অসন্তুষ্ট। দেশীয় লোকেরা বিলাতপ্রত্যাগত লোকদিগের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করিয়া থাকেন, আমরা সেই সকল অভিযোগের এক একটী করিয়া ধরিব এবং তৎসম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করিব।

১ম অভিযোগ—বিলাতপ্রত্যাগতগণের মধ্যে জাতীয় ভাবের বিশেষ অভাব, ইহাঁরা বিজাতীয় ভাব পূর্ণ। এখন জিজ্ঞাস্য, কি করিয়া জানিলে যে, ইহাঁদের মধ্যে জাতীয় ভাব নাই? প্রতিপক্ষ উত্তরে এই বলিবেন, ইহাঁদের পরিচ্ছদ বিজাতীয় ভাবের প্রধান পরিচিহ্ন। অনেকেই বলিয়া থাকেন,

বিলাতপ্রত্যাগত বাঙ্গালীরা জাতীয় পরিচ্ছদ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে বিজাতীয় আকার ধারণ করেন। কেবলমাত্র বসন ভূষণের প্রভেদ বশতঃই যদি আমরা বিলাতপ্রত্যাগতদিগকে বিজাতীয় বলিয়া ঘৃণা করি ও তাঁহাদের সঙ্গে মিশিতে কুণ্ঠিত হই, তাহা হইলে নিতান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে বিলাতপ্রত্যাগতদিগের বিশেষ কোন দোষ দৃষ্ট হয় না, কেবল আমাদেরই অনুদারতা এবং সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পায়। আজ কাল জাতীয়তা লইয়া বড়ই গোলযোগ চলিতেছে। এমনও কতকগুলি কুশিক্ষা-প্রাপ্ত লোক আছে, যাহারা মনে করে, যে সকল লোক ন্যায় বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া সকল প্রকার সামাজিক কুসংস্কার হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন রাখে, যাহাদের হস্ত বালবিধবার অশ্রুজল মুছাইতে সর্ব্বদা ব্যগ্র, যাহারা জাতিভেদ ঈশ্বরের বিধান বহির্ভূত মনে করিয়া অন্য বর্ণের সহিত আহার বিহার, কি আদান প্রদান করিয়া থাকে, ইহারাও বিজাতীয় ভাব পূর্ণ, অস্পৃশ্য, স্বদেশ-বিরোধী। এই বলিয়া ইহাদের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচারও করিয়া থাকে। এই সকল সঙ্কীর্ণ-মনা লোকের সহিত তর্কে কান প্রয়োজন নাই। যাহারা বিবেকের আদেশের পবিত্রতা বুঝিতে ক্ষম, স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম্ম যাহারা বুঝে না, "পশার" ব্যতীত যাহাদের ার্য্যের অন্য কোন পবিত্রতর পরিচালক নাই, তাহাদের সঙ্গে তর্ক করা ার বায়ুতে অসি প্রহার করা, উভয়ই সমান। যাঁহারা বলেন, বিলাত-ত্যাগতদিগের বিজাতীয় ভাবের প্রধান চিহ্ন বিজাতীয় পরিচ্ছদ, তাঁহা-দগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, বাঙ্গালীর জাতীয় পরিচ্ছদ কি? সত্য থা বলিতে কি, বাঙ্গালীর কোন জাতীয় পরিচ্ছদ নাই। মুসলমান যখন এদেশের রাজা ছিল, তখন বাঙ্গালী একবারে মুসলমান সাজিয়াছিল। এই যে চাপ্‌কান চোগা এবং শামলা, যাহা আমরা অনেকে জাতীয় পরিচ্ছদ বলিয়া মনে করি, তাহা বাস্তবিক মুসলমানদিগের নিকট হইতে গৃহীত। "ঝোলা-পাজামা" এখন ইংরেজের সংঘর্ষণে সূক্ষ্মতর দেহ ধারণ করিয়াছে এবং ইহার নাম এখন "প্যান্টালুন"। তবে জানিতে চাই, মুসলমানগণের নিকট হইতে যে চাপ্‌কান চোগা ইত্যাদি লইয়াছি, তাহা যদি জাতীয় পরিচ্ছদ হইতে পারিল, তবে ইংরাজ-রাজত্বে বাস করিয়া ইংরাজের পোষাক গ্রহণে আপত্তি কি এবং তাহার প্রতি এত আকুঞ্চন কেন? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ধুতি চাদর বাঙ্গালীর জাতীয় পরিচ্ছদ। মানিলাম; কিন্তু

কামিজ ও কোটটী কোথা হইতে পাইলে? এমন সুন্দর জুতা যোড়া, কেমন সুন্দর মোজা, ইহা কোথা হইতে পাইলে? ইহাতো ইংরাজের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছ। তবে প্যাণ্টালুনটীর উপর এত ঘৃণা কেন? এখন দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালীর কোন জাতীয় পরিচ্ছদ নাই এবং যে পর্য্যন্ত এইরূপ কোন একটা জাতীয় পরিচ্ছদ না হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত একের অন্যের পোষাকের প্রতি বিদ্বেষ-নয়নে দৃষ্টি করিবার কোন অধিকার নাই। তাই বলি, পরিচ্ছদ লইয়া এত গোলযোগ কেন? পরিচ্ছদের সহিত জাতীয়তার বিন্দুমাত্রও সম্বন্ধ নাই। জাতীয়ভাব অর্থাৎ স্বজাতি-প্রেম বা স্বদেশ-প্রেম হৃদয়ের জিনিস, উহার সহিত বাহিরের পরিচ্ছদের কোন সম্বন্ধ নাই। যদি দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও, তবে ক্ষুদ্র দ্বীপ জাপান রাজ্যে গমন কর। দেখিবে, জাপানবাসী প্রায় সকলেই য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়াছে। সেই হ্যাট, সেই কোট, সেই প্যাণ্টুলান, সকলই সেই, কোন বিভিন্নতা দেখিতে পাইবে না। পরিচ্ছদ তাহারা আমেরিকান দিগের নিকট হইতে অনুকরণ করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি কেহ বলিতে পারে, জাপান বাসীদের জাতীয় ভাব নাই? কখনই না। স্বজাতি-প্রেমে জাপানবাসী কোন জাতি হইতেই হীন নহে। কোন্ শক্তি বলে এই ক্ষুদ্র দ্বীপ এত গৌরব, এত সমৃদ্ধির অধিকারী হইয়াছে?—স্বজাতি প্রেম। যাহাদিগকে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অসভ্য বলিয়া সভ্যতাভিমানী য়ুরোপীয় ও আমেরিকগণ ঘৃণা করিত, আজ স্বজাতি প্রেমের মোহ মন্ত্রে সেই অসভ্য জাতি অনেক সভ্য জাতিকে পরাস্থ করিয়াছে। তাই আবার বলি, জাতীয়তার সহিত পরিচ্ছদের সম্পর্ক কি? স্বর্গীয় কৃষ্ণমোহন প্রায় সমস্ত জীবন বিজাতীয় পরিচ্ছদে কাটাইয়াছেন। কিন্তু, হে ভারত উদ্ধারী ভাই, তাঁহার হৃদয়ে যে স্বজাতি-প্রেম—তাঁহার প্রাণে যে স্বদেশ হিতৈষণা ছিল, বুকে হাত দিয়া বল দেখি, তোমার হৃদয়ে তাহার লক্ষাংশের একাংশও আছে কি? তাঁহার প্রাণভরা স্বজাতি-প্রেম, তাই জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বদেশের পরিচর্য্যা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন আর তুমি আমি কি করিলাম, বিদ্বেষভাব পরতন্ত্র হইয়া প্রত্যেক আস্তা কুড়ায় যাইয়া দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনা সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা পুস্তক ও সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠা রঞ্জিত করতঃ বাহাদুরী বিস্তার করিলাম, "ভারত-উদ্ধারী" নাম কিনিলাম !!

দ্বিতীয় অভিযোগ—কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, একটু গোময় ভক্ষণ করিলে কিম্বা কেশাগ্র কিঞ্চিৎ ছেদন করিলে যদি দেশের লোক ও আত্মীয় স্বজন সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালীগণের জাতীয়তার অনুরোধে এই যৎসামান্য ত্যাগ স্বীকারে আপত্তি উত্থাপন করা বিধেয় নহে। বরং এই সামান্য প্রথাটী অবলম্বন পূর্ব্বক, আপনাদের স্বজাতি-প্রেমের পরিচয় দেওয়া উচিত। যাঁহারা বিলাত-প্রত্যাগত-দিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহাদিগকে আমরা দেশের প্রকৃত শত্রু বলিয়া গণ্য করি। সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক, যে সকল লোকেরা শিক্ষাভিমানে মহা স্ফীত, যাহারা আপনাদিগকে দেশের প্রতিনিধি বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাঁহারাও সাধারণ সংবাদ পত্রে এরূপ ভয়ঙ্কর মত প্রচার করিতে সঙ্কোচিত নহেন। হতভাগ্য ভারতভূমি, ইঁহারাই আবার তোমার প্রতিনিধি। যে সকল দেশীয় লোক বিলাতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা কেবল কথায় নহে, কার্য্যে জাতিভেদের কলঙ্কিত বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন, আপনাদের উন্নত জ্ঞান বলে জানিতে পারিয়াছেন যে, প একটী জঘন্য প্রথা মানব সমাজের কলঙ্ক ব্যতীত আর কিছুই নহে। তুমি কি চাও যে, ইঁহারা সেই কল্পিত জাতীয়তার অনুরোধে তাঁহাদের ত জ্ঞান ও বিশ্বাস, বিবেকের আদেশ, ও সুমার্জ্জিত রুচি পতিত সমাজের রণে বিসর্জ্জন দিবেন? নিতান্ত কাপুরুষ না হইলে কেহ কাহারও কট এরূপ ভয়ানক কাপুরুষতা প্রত্যাশা করিতে পারে না। জিজ্ঞাসা রি, তোমাদের জাতীয়তার অর্থ কি? কাপুরুষতা, ভণ্ডামি ও কপটতা যদি জাতীয়তার লক্ষণ হয়, তবে এই বিকৃত জাতীয় ভাবের উপর পদাঘাত করিয়া চিরদিন আপনার বিবেকের স্বাধীনতা লইয়া বিদেশে বিজাতীয় হইয়া থাকিব, ইহাও শ্লাঘনীয়। কি সুখে সেই স্থানে, সেই সংসর্গে থাকিব, যে স্থানে স্বাধীনতার আদর নাই, যে স্থানে কপটতা ও স্বজাতি-প্রেম একই মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে, কাপুরুষতা যে স্থানে পুরুষত্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। বিরাগী হইয়া বনে বনে নিকৃষ্ট জন্তুর সঙ্গে বাস করা রং শ্রেয়ঃ তথাপি এ কলঙ্কিত ও পূতি গন্ধময় মানব সমাজের সংস্পর্শে আসা উচিত নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিলাত-প্রত্যাগত স্বদেশীদের নিকট হইতে আমরা যে রূপ সদ্দৃষ্টান্ত ও নৈতিক সাহস আশা করি, সকলে আমাদের

সেই আশা পূর্ণ করেন না। কেহ কেহ স্বদেশে আসিয়া এরূপ জঘন্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন যে, তাঁহাদের নাম করিতেও লজ্জা হয়। ইচ্ছা হয়, তাঁহাদের "ডিপ্লোমা"গুলি লইয়া অগ্নিতে ভস্ম করিয়া নদী জলে নিক্ষেপ করি। সে দিনও বোম্বাই প্রদেশে নানা ভাষাবিৎ, নানা উপাধি (ব্যাধি) ধারী একজন বিলাত-প্রত্যাগত ব্রাহ্মণ গোময় ভক্ষণ করিয়া বিলাত গমন ও তথায় অধ্যয়ন ইত্যাদি মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। হতভাগ্য, যদি জানিতে তোমার মধ্যে একটুও নৈতিক সাহস নাই, যদি দেশে ফিরিয়া আসিয়া এরূপ জঘন্য ভাবে জাতি রক্ষা করিতে হইবে বুঝিতে পারিয়াছিলে, কেন তবে তোমার এ দুর্ম্মতি হইয়াছিল, কেন এ কুকাজ করিলে? ধিক্, শত ধিক্ সেই শিক্ষায়, যাহাতে মনে একটুও নৈতিক সাহস দিতে পারে নাই। যশোলিপ্সা মানবের ভয়ানক শত্রু; উহাতে যেরূপ মানবের সর্ব্বনাশ করিতে পারে, আর কিছুতেই সেরূপ পারে না। পশার ও প্রতিপত্তি অতি ভয়ঙ্কর জিনিস। বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালীদের মধ্যে এমনও পশার-লোভী লোক আছেন, যাহারা আমাদের সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহস পান না,—ভয়, পাছে প্রতিপত্তিটুকু যায়।

যাঁহারা বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালীদিগকে জাতীয় ভাব বিহীন বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, আজ ক দেশময় যে রাজনৈতিক আন্দোলন চলিতেছে, ইহার মূল কে? অস্বীকা করিতে পারিবেন না যে, বিলাত-প্রত্যাগতগণ এই আন্দোলনের মূ ১০বৎসর পূর্ব্বে বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালীগণ যেরূপ ছিলেন, এখ আর সেরূপ নাই, পূর্ব্বে তাঁহারা দেশ-হিতকর কার্য্যে যেরূপ ঔদাসীন্য দেখাইতেন, তাহা সময়ের অদ্ভুত আবর্ত্তনে যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে এখন দেখিতেছি, বিলাত-প্রত্যাগতগণ প্রত্যেক দেশ-হিতকর কার্য্যে অগ্রে নিশান লইয়া যাইতেছেন, আর দেশের শিক্ষিত লোক তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছেন। ১০বৎসর পূর্ব্বে যে লালমোহনের নাম ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ ছিল, আজ সেই লালমোহনের নাম দিক্ দিগন্তরে ছাইয়া পড়িয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও কি বলিবে বিলাত-প্রত্যাগতদিগের জাতীয় ভাব নাই?

বিলাতপ্রত্যাগতদিগের বিরুদ্ধে আর একটী অভিযোগ—"ইহারা

বড় সাহেবদের সংসর্গ ভক্ত, স্বদেশীয়দিগের সঙ্গ বড় ভালবাসেন না।" এই অভিযোগটী একেবারে অমূলক। কাহার প্রতি কাহার অধিক টান, তাহা কার্য্য দ্বারাই বোঝা যায়। সত্য বটে, সভ্যতার খাতিরে বিলাত-প্রত্যাগতদিগকে সাহেবদিগের সহিত অনেক সময় মিশামিশি করিতে হয়, কিন্তু, তাহা বলিয়া তাঁহারা স্বজাতি-বিদ্বেষী এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই।

তর্কচ্ছলে মানিলাম যে, বিলাতপ্রত্যাগতগণ সাহেব-সংসর্গ বড়ই ভাল বোধ করেন। কিন্তু তুমি আমি কি করি না? বিলাত-প্রত্যাগতগণ সাহেবদের সঙ্গে মিশেন,—সমান ভাবে—বন্ধুভাবে। আর তুমি আমি মিশিতে যাই, প্রভু ও ভৃত্যভাবে। লম্বা এক চাপ্‌কান পরিয়া, সামলা মাথায় দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সাহেবের বাঙ্গালোর বাহিরে গিয়া আমরা উপস্থিত হই। চাপ্‌রাসী যদি অনুগ্রহ করে, তবে সাহেবের নিকট সংবাদ যাই, সাহেবের যদি অনুগ্রহ হইল, তাহা হইলে দেখা হইবে; নতুবা সময় নাই বলিয়া বিদায় করিবেন। সাহেবের যখন বড়ই অনুগ্রহ হইল, দুই তিনটী কথা বলিয়া তোমাকে বিদায় করিয়া দিলেন, আর তুমি সেলাম করিতে করিতে ও আপনার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে দিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলে!

এখন তোমার অবস্থা বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালীর অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া দেখ, কে উচ্চ আর কে নীচ। বিলাত-প্রত্যাগত ব্যক্তি সাহেবদের সঙ্গে সমানভাবে মিশিয়া থাকেন, আর তুমি চাটুকার ভাবে। এত লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিয়াও তুমি সাহেবকে সেলাম দিতে ক্ষান্ত থাক না। এখন দেখ, কাহার অবস্থা শোচনীয় এবং কে অধিক সাহেব ভক্ত।

আমরা ইহা বলিতে চাই না যে, বিলাত-প্রত্যাগত স্বদেশীয়গণ একেবারে নির্দ্দোষী। দোষ কাহার নাআছে? কিন্তু তাঁহাদের গুণ সমাদর না করিয়া কেবল তাঁহাদের দোষ লইয়া আলোচনা কেন? পরস্পরের মধ্যে যে দোষ আছে, তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়া ভ্রাতৃভাবে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করা কর্ত্তব্য। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা বিলাতিশিক্ষা-প্রাপ্ত স্বদেশীয়-দিগকে এরূপভাবে গ্রহণ করিতে না পারিব, তত দিন তাঁহাদের শিক্ষা, জ্ঞান, সভ্যতা ও অভিজ্ঞতা আমাদের কোন কাজে আসিবে না। কিন্তু দুঃখের

বিষয় আমাদের সমাজ এমনি অনুদার ও সংকীর্ণ যে, যে পর্যান্ত বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালীগণ গোময় ভক্ষণ না করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত ইহাঁদিগকে বিজাতীয় বলিয়া সমাজ-সীমার বাহিরে রাখিবে। অনেক সময় এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, আমাদের বিলাত-প্রত্যাগত স্বদেশীয়গণের মধ্যে কেহ কেহ সমাজের এরূপ অনুদারতা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হন, এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া আপনার স্বাধীনতা লইয়া স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ইহাতে সমাজের কোন শিক্ষা হয় না। তাঁহারা এই সকল সামাজিক অত্যাচার সহ্য করিয়াও যদি আপনাদের কার্য্য দ্বারা স্বজাতি-প্রেম দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এই সাধু দৃষ্টান্তে সমাজের অনুদারতা ক্রমেই কমিয়া আসিবে। যদি দেখিতে পাই, একটী লোক আমার জন্য কি আমার দেশের জন্য প্রাণপণে খাটিতেছে, আমি ইচ্ছা করি আর না করি, তাহার প্রতি ভক্তি আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইবে। এই ভাবে সমাজকে শিক্ষা দিতে হইবে। সমাজকে দেখাইব যে, সমা[illegible] অনুরোধে, কুসংস্কারের অনুরোধে আপনার প্রাণের স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জ[illegible]দিতে প্রস্তুত নই, স্বাধীনতা প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, আবার অন্য দিকে দেখাইব, সমাজ আমাকে চায় আর না চায়, আমার প্রাণ স্বদেশের দুঃখে কাতর, আমা[illegible] হস্ত স্বদেশের কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত। বিলাত-প্রত্যাগত স্বদেশীয়দিগে[illegible] মধ্যে অনেকে এরূপ সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, এবং যখন তাঁহারা সক[illegible] মিলিয়া স্বজাতি প্রেমে বিগলিত হইয়া স্বদেশের পরিচর্য্যা করিতে আরম্ভ করিবেন, তখন নিশ্চয়ই সমাজের পাষাণ-প্রাণ গলিয়া যাইবে—আপনিই আসিয়া ভ্রাতৃভাবে ইহাঁদিগকে আলিঙ্গন করিবে।

সমাজকেও বলি, অনুদার সমাজ, আর কতকাল বিলাত-প্রত্যাগত স্বদেশীয়দিগের প্রতি এরূপ ভাবে অত্যাচার করিবে? দেখনা কি, এই অনু-দারতা ও কুসংস্কারই দেশের দুর্গতির কারণ। এখনো কি স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর শিক্ষা করিলে না? শিখিবেই বা কি করিয়া?—শত শত বৎসর হইতে যে জাতি পর-পদানত, রাজার অত্যাচার ও সমাজের অত্যাচার উভয়ে মিলিয়া যে দেশের রক্ত মাংস শোষণ করিয়াছে, সেই দেশের সেই জাতি স্বাধীনতার মর্ম্ম কিরূপে বুঝিবে? কুসংস্কার ও কুশিক্ষা যে দেশের অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, সে দেশের লোক উদারতা কিরূপে শিখিবে?

স্বাধীনতা স্বর্গীয পদার্থ;—উহাব মধুরতা আমবা বুঝিতে পাবি নাই, জানি না কবে পাবিব।

"Liberty is sacred, as the individual, of whose life it is the reflex, is sacred Where liberty is not life is reduced to a mere organic function, *and when man allows the violation of his liberty, he is false to his own nature, and rebels against the decree of God*"

(Mazzini on the Duties of man——Liberty)

এই অমৃতময়ী কথা তাঁহাবই হৃদয হইতে বাহিব হইয়াছিল, যিনি স্বাধীনতাব জন্য আপনাব যথা-সৰ্ব্বস্ব এবং জীবন উৎসর্গ কবিয়াছিলেন। হায! কবে আমাদেব সমাজ এই মহাবাক্যেব মৰ্ম্ম গ্রহণ করিযা লোকেব স্বাধীনতাব নিকট আপনাব মস্তক অবনত কবিতে শিক্ষা কবিবে?

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সেন।

তাম্বুলোপহাব।

(১)

পাতি হাঁস যেমন স্বভাবতঃ জলে চবে, সেইরূপ আমাদিগের আত্মা ঈশ্বরে চবে।

(২)

আমরা ঈশ্বরেব নানা কাতুবে ছেলে, একটু দুঃখেই আমরা কাতর হই।

(৩)

আমাদিগের সকল দুঃখ মঙ্গলেরই কারণ। অন্ধকারে যেমন [illegible]কে ভুত দেখে, আমরা তেমনি অজ্ঞানান্ধকারে দুঃখ দেখি।

---

* এই প্রবন্ধটী সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যান-সম্মিলনীতে পঠিত হইয়াছিল।

ভূতের ভযেই গেলাম। ভূতের ভয না ছুটিলে আমরা কখন মানুষ হইতে পারিব না।

(৪)

পিতা মুখোষ পরিলে যেমন ছেলে ভয় পায, তেমনি ঈশ্বর দুঃখ-রূপ মুখোষ পরিলে আমরা ভয পাই। পিতা মুখোষ পরিলে যেমন পিতাই থাকেন, তেমনি পরম পিতা আমাদিগের সম্বন্ধে দুঃখ-রূপ মুখোষ পরিলেও সেই পরম পিতাই থাকেন।

(৫)

দার্শনিকেরা ঈশ্বরের এচোড়ে-পাকা ছেলে, তত্ত্ব সকল যত দূর মানবীয় অবস্থাতে জানা যাইতে পারে, তাঁহারা তাহা অপেক্ষা জানিতে চেষ্টা করেন। পারলৌকিক অবস্থাতে তাঁহাদের কত ভ্রম দূর হইবে ও সত্যের আলোক কত প্রকাশিত হইবে, বলা যায় না। একটু বিলম্ব কর, এত অধৈর্য্য কেন?

(৬)

অস্থি, মাংস, শিরা প্রভৃতি দ্বারা রচিত এই শরীর আত্মার নটবহর। এই নটবহর লইয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। কোন কোন সময় তাহাতে বিরক্ত হইতে হয়।

(৭)

শরীর আত্মার লেফাফা মাত্র। যে কেবল শরীরের বেশভূষার প্রতি মনোযোগী এবং সারবত্তা-শূন্য, তাহাকে আমি কেবল লেফাফা-দুরস্ত ব্যক্তি বলি।

(৮)

শামুকের খোলা যেমন মস্ত, কিন্তু ভিতরের জীবটী অতি ছোট; তেমনি প্রকৃত ধর্ম্ম অতি সংক্ষেপ ও সরল, কিন্তু ধর্ম্মের বাহ্য অবয়ব মস্ত। প্রকৃত ধর্ম্মের প্রতি লোকের তত মনোযোগ নাই। এই বাহ্য অবয়ব লইয়া কত মারামারি!

(৯)

যেমন প্রসবের সময় ছেলের মাথা একটু একটু পৃথিবীর দিকে দেখা দেয়, তেমনি বৃদ্ধ মানুষের মাথা পরকালের দিকে একটু একটু দেখা দিতেছে, সেইখানে টুষ্ করিয়া গিয়া পড়িলেই হইল।

(১০)

কোন ব্যক্তি পাপ-প্রবৃত্তির দমনের প্রকৃষ্ট উপায় কি জিজ্ঞাসা করাতে আমি বলিলাম যে, পাপেচ্ছা যখনই মনে উদিত হইবে, তখনই আপনাকে কোসে আধ্যাত্মিক লাথি মারাই পাপ-প্রবৃত্তি দমনের প্রকৃষ্ট উপায়। আধ্যাত্মিক লাথি অবশ্য শারীরিক কার্য্য নহে, আধ্যাত্মিক কার্য্য।

(১১)

যখন পাপেচ্ছা মনে উদিত হইবে, তখন পূর্ব্বকৃত পাপ জন্য পুনরায় অনুতাপ করিবে। তাহাতে এক ঢিলে দুই পক্ষী মারা হইবে, অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত পাপ আরো প্রক্ষালিত হইবে এবং নূতন পাপমতি দমন হইবে।

(১২)

কোন কোন জ্ঞানী বলেন যে, পশুদিগের ধর্ম্ম-বোধ আছে; অন্যান্য জ্ঞানীরা বলেন, তাহা তাহাদের আদোবে নাই। শেষোক্ত জ্ঞানীরা আমাদিগের অন্যান্য জীবভ্রাতাদিগকে মানবীয় অধিকারের কিঞ্চিৎ অংশও দিতে নারাজ; কিন্তু এরূপ নারাজির কোন বিশিষ্ট হেতু দেখি না। উক্ত জীব-ভ্রাতাদিগের ধর্ম্ম-বোধ আছে প্রমাণিত হইলেও তাহা মনুষ্যের সঙ্গে তুলনায় অবশ্য অল্প হইবে, তাহাতে আমাদিগের প্রাধান্যের বিশেষ হানি হইবে না, অথচ মানবীয় অধিকারের অতি অল্পাংশ পাইয়াই উক্ত ভ্রাতারা সন্তুষ্ট হইবেন।

(১৩)

ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি প্রত্যাশা করেন যে, লোকে তাঁহাকে মাথায়

করিয়া সমস্ত দিন রাত্রি নাচিবে, কিন্তু এরূপ প্রত্যাশা করা অন্যায়, যেহেতু তাহাদিগের অন্যান্য অনেক কাজ আছে।

(১৪)

অনেক মনুষ্য কেবল আলু পটোলের কথা লইয়া সমস্ত দিন থাকে, এরূপ থাকা কর্ত্তব্য নহে, আলু পটোলের যতদূর অতীত হইতে পারা যায়, হওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

হস্তামলক।

একটী সুন্দর বালক পথের ধারে বসিয়াছিল। তাহাকে দেখি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—

শিশু, তুমি কে, কাহার পুত্র, কোথা হইতে আসিয়াছ, কোথায় যাইবে, তোমার নামটা কি?

বালক বলিল,—আমি মনুষ্য নহি, দেবতা বা যক্ষ নহি। আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহি। আমি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা ভিক্ষুক নহি। আমি জ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ১।

লোক চেষ্টার নিমিত্তকারণ যেমন সূর্য্য, আমি তেমনি মনশ্চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি-কারণ, উপাধিশূন্য বিচ্ছেদশূন্য নিত্য-জ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ২।

অগ্নিকে আশ্রয় করিয়া জড় পদার্থ যেমন গতিশীল হয়, তেমনি যাহার আশ্রয়ে বিবিধ ইন্দ্রিয় স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, আমি সেই নিবাত-নিষ্কম্প নিত্য-জ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ৩।

দর্পণজাত প্রতিবিম্ব অবস্তু, সে যাহার প্রতিবিম্ব সে মুখখানি বস্তু। জীবত্ব যাঁহার প্রতিবিম্ব, আমি সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ৪।

দর্পণের অভাবে আভাসের অভাব হয়, কিন্তু অকল্পিত বাস্তব মুখের কোন হানি হয় না। বুদ্ধি বিযোগে জীবত্বের অভাব হইলেও যাহার অভাব হয় না, আমি সেই বাস্তব নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ৫।

ইন্দ্রিয়-বিমুক্ত অথচ ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়, আমি ইন্দ্রিয়াতীত সেই নিত্য-জ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ৬।

একই সূর্য্যের আভাস পাত্র ভিন্নতায় বিভিন্ন হয়, সেই রূপ জীব-বুদ্ধিতে বিভিন্ন কল্পিত হইলেও যাহার একত্বের লোপ হয় না, আমি সেই স্বপ্রকাশ শুদ্ধচিত্ত নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ৭।

সূর্য্য স্বয়ং অদ্বিতীয় হইয়া অনেক চক্ষুর বিষয় উদ্ভাসিত করেন, তেমনি যিনি স্বয়ং অদ্বিতীয় হইয়া অনেক বুদ্ধির বিষয়কে উদ্ভাসিত করেন, আমি সেই অদ্বিতীয় সর্ব্ব-প্রকাশক নিত্য-জ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ৮।

সূর্য্যোদ্ভাসিত পদার্থ রূপ চক্ষু-গ্রাহ্য, অনুদ্ভাসিত পদার্থ-রূপ চক্ষু-গ্রাহ্য নহে। যাহার জ্যোতিতে সর্ব্ব-প্রভাতক্ষম সূর্য্য জ্যোতিষ্মান্, আমি সেই সর্ব্ব-প্রকাশক নিত্য-জ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ৯।

অদ্বিতীয় সূর্য্য চঞ্চল জলে অনেক রূপে—কিন্তু স্থির জলে অবিভক্ত রূপে প্রকাশিত হন, সেই রূপ চঞ্চল বুদ্ধিতে অনেক রূপে—কিন্তু স্থির-বুদ্ধিতে একরূপে যিনি প্রতীত হন, আমি সেই নিত্য-জ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ১০।

অতি মূঢ় ব্যক্তি ঘনাচ্ছন্ন দৃষ্টি হইয়া যেমন সূর্য্যকে ঘনাচ্ছন্ন ও নিষ্প্রভ মনে করে, তেমনি অজ্ঞান-বদ্ধ-দৃষ্টি মূঢ়দিগের নিকট যে শুদ্ধ চৈতন্য বদ্ধ ভাবে প্রতীত হন, আমি সেই নিত্য-জ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ১১।

স্পর্শ না করিয়াও যিনি আকাশের ন্যায় তাবৎ বস্তুতে অনুস্যূত রহিয়াছেন, শুদ্ধ অচ্ছের ন্যায় আমি সেই নিত্য-জ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ১২।

হে বিষ্ণু, উপাধি ভেদে যেমন মণির পার্থক্য প্রতীত হয়, বুদ্ধি ভেদে তুমিও সেইরূপ বিভিন্ন রূপে প্রতীত হও। স্থির চন্দ্র চঞ্চল জলে যেমন চঞ্চল রূপে প্রতীত হয়, অস্থির বুদ্ধিতে তুমিও তদ্রূপ চঞ্চল রূপে প্রতীত হও।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এ।

আবাহন।

১

গৃহে এস জীবনের আনন্দ-আলোক,
নিত্য সম্মিলন হাসি
বরষি, তামস রাশি
দূর কর বিরহের. চির-প্রাণাধার,
তোমার দূরতা ক্ষণে সহেনা আমার।

২

প্রতিভার পূর্ণ ভাতি, স্নেহখণী-ভূত,
তব প্রতিবিম্বে বাঁচি,
তোমাতে ডুবিয়া আছি,
তোমার(ই) শরীরী ছায়া আমি, এ অন্তরে
হৃদয়-বল্লভ এস চিরদিন তরে।

৩

তব দরশন-রাজ্যে অমা-নিশা নাই,
প্রণয়ের সুষমায
অবিরাম দীপ্তি পায়
বিমুক্ত স্মৃতির কক্ষ, স্নেহের কিরণে
সঞ্জীবনী সুধাসার বরষ জীবনে।

৪

প্রতি পদার্পণে তব বসন্ত বিকাশ,
ফুটে ফুল পরিমলে
হিয়াবন-ভূমিতলে

তোমার সঙ্গীত-ভরা স্বর পরশনে,
ঘুমন্ত হৃদয়-তন্ত্রী বাজে কম স্বনে।

৫

চিন্তার বিহগ মম সে কণ্ঠ শুনিয়া
মানসে জাগিয়া উঠে
সে গীত লহরে ছুটে
গায়, প্রেম-মন্দাকিনী মাধুরী সঞ্চারে,
বঞ্চিত আশার মোহ খেলে চারি ধারে।

৬

প্রাণের মিলন দেশে কল্পনা-প্রবাহে,
ভাবের কোমল বায়,
সুখ-শিশু শোভা পায়,
হৃদয়ের হৃদয়েতে, সুধ দরশনে
নূতন জীবন-স্রোত বাড়ে প্রতিক্ষণে।

৭

প্রেমের কাহিনীময় প্রতি দরশন,
সে দর্শন-ইতিহাসে
অপূর্ব্ব কবিত্ব ভাসে,
অপার্থিব সম্মিলন, প্রীতি-সম্ভাষণে
চিত্রিত বাসনা স্বর্গ দেখায় জীবনে।

৮

প্লাবিত সুখের সহ যাই হারাইয়া
শুনি পদধ্বনি তব
দূরে, বিকম্পিত সব
আজিও নয়নে মম, হিয়ায় হিয়ায়
মিলনের ঐক্যতান বরষিয়া যায়!

৯

ভুলে যাই বরষের আঁধার রজনী
শশীশূন্য প্রতি যামে,
সূর্য্য হীন দিনমানে
ঝরিত সে অশ্রুনীর, তব দূরতায়,
দরশনে মুগ্ধ হিয়া কিছু নাহি চায়।

১০

গৃহে এস, জীবনের পার্থিব-ঈশ্বর।
প্রাণপুষ্পে আমরণ
পূজিব হে অনুক্ষণ,
আবাহন করি, এস, হৃদয়-মন্দিরে,
বিরাজ প্রেমের দিব্য মুরতির ভরে।

শ্রীমতী নীহারিকা।

সমালোচনা।

ভারত-শ্রমজীবী—দ্বিতীয় কল্প, ১ম ও ২য় সংখ্যা। ২নং বেনেটোলা লেন হইতে প্রকাশিত। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্রিকা। আমরা ভারত-শ্রমজীবীর পুনঃ প্রকাশ দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। এক সময় এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানি দ্বারা বঙ্গ দেশের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের শিক্ষার সুবিধা হইয়াছিল। ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত কতকগুলি কাগজ গ্রহণ করিয়া সাধারণ লোকের মধ্যে বিতরণ করিতেন। এরূপ

উপকারী কাগজের অকাল মৃত্যুতে আমরা বাস্তবিক দুঃখিত হইয়াছিলাম। তাই আমরা আবার ইহা পুনঃ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

আজ কাল আমাদের দেশে সাপ্তাহিক, মাসিক অনেক পত্রিকাই চলিতেছে, কিন্তু এ প্রকারের কাগজ বোধ হয় দ্বিতীয় আর একখানা নাই। যতদিন পর্য্যন্ত দেশের সাধারণ লোক শিক্ষিত না হইতেছে, তাহাদের কুসংস্কার বিদূরিত না হইতেছে, তত দিন বড় বড় খবরের কাগজ দ্বারা দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে মনে হয় না। ভারত-শ্রমজীবী যদি সে কার্য্য সাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার "শ্রমজীবী" নাম গ্রহণ সার্থক হইবে, দেশের একটা গুরুতর অভাব পরিপূরণে সমর্থ হইবেন।

আমরা যে দুই সংখ্যা ভারত-শ্রমজীবী পাইয়াছি, তাহার অধিকাংশ প্রবন্ধ পড়িয়া ও ছবি গুলি দেখিয়া প্রীত হইয়াছি, কিন্তু দুই একটা প্রবন্ধের ভাষা আমাদের নিকট একটু জটিল বোধ হইল। সাধারণ লোকে—শ্রমজীবীগণ সেরূপ ভাষা বুঝিবে কিনা, আমাদের গভীর সন্দেহ। আমাদের বিশ্বাস, ভাষা যতদূর সহজবোধ্য হইতে পারে, ইহার পরিচালকগণ সে চেষ্টা দেখিলে প্রকৃত উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে। আমাদিগকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, প্রথম সংখ্যার এক স্থানে একটু বিকৃত রুচির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আশা করি, সম্পাদক মহাশয়, রসিকতা করিতে যাইয়া সুরুচির সীমা উল্লঙ্ঘন করিবেন না। আমরা শ্রমজীবীর উত্তরোত্তর উন্নতি দেখিলে সুখী হইব।

মহারাজা নন্দকুমার—অথবা শত বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। এখানি একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। পুস্তকের আকারের তুলনায় মূল্য অতি কম; মুদ্রাঙ্কন অতি পরিপাটী। ইহাতে উপন্যাসের গুণ যত না আছে, ঐতিহাসিক ঘটনা তদপেক্ষা অনেক অধিক আছে। রমেশ বাবুর "শত বর্ষ" পড়িতে পড়িতে ভারতের পূর্ব্ব গৌরবে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠে, আর "মহারাজা নন্দকুমারে"ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচার কাহিনী পড়িতে পড়িতে শরীরের রক্ত গরম হইয়া উঠে। মানুষ মানুষের উপর অর্থলোভে কিরূপ অমানুষিক নৃশংস অত্যাচার করিতে পারে, স্বার্থের

চরণে ধর্ম্ম কর্ম্ম, বিবেক বুদ্ধি কিরূপে বিসর্জ্জন দিতে পারে, তাহার চিত্র ইহাতে বেশ চিত্রিত হইয়াছে। যদি চণ্ডী বাবুর লেখনীর তেমন জোর থাকিত—ভাষার তেমন ওজস্বিনী শক্তি থাকিত, তবে আজ এই সকল পৈশাচিক দৃশ্য পাঠ করিয়া লোকে ক্ষেপিয়া উঠিত; তবে মিসেস্ ষ্টোর গ্রন্থে দাস-ব্যবসায়ের অত্যাচার কাহিনী পাঠ করিয়া যেরূপ লোকে চমকিত হইয়াছিল, আজ চণ্ডী বাবুর গ্রন্থের লোমহর্ষণ ঘটনাবলী পাঠ করিয়াও বঙ্গবাসী মাত্রে তদ্রূপ চমকিত হইত। তথাপি চণ্ডী বাবু শত বর্ষ পূর্ব্বে এদেশ-প্রবাসী ইংরেজ চরিত্রের—গবর্ণরদিগের যে চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন তাহা হৃদয়োত্তেজক ও চিত্ত-দ্রবকারী। "বঙ্গবাসিদিগের প্রতি মুসলমানদিগের সময়ও অত্যাচার হইত, কিন্তু এইরূপ ভীষণ অত্যাচার কখন হয় নাই"—বাঙ্গালি বিদ্বেষী, বাঙ্গালি-চরিত্রের কুৎসাকীর্ত্তনকারী মেকলের এই উক্তির প্রতি কথা গ্রন্থকার তৎকালের ইংরেজ-চরিত্র দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন। তিনি নানা স্থান হইতে এই সকল অত্যাচারের যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি বঙ্গবাসী মাত্রের ধন্যবাদার্হ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। ভারতবর্ষের ইংরেজ ইতিহাসলেখকগণ রাজা নন্দকুমারের চরিত্র যেরূপ জঘন্য করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া নন্দকুমারকে পিশাচ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু নন্দকুমার বাস্তবিক যে তদ্রূপ জঘন্য চরিত্রের লোক ছিলেন না, ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ যে একমাত্র স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাঁহাকে এরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছিলেন, গ্রন্থকার তাহা বেশ সুন্দর রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

এখন ঔপন্যাসিক অংশ সম্বন্ধে গুটিদুই কথা। বাপুদেব শাস্ত্রী, প্রমদা দেবী ও সাবিত্রীর চরিত্র বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে, তার নীচেই এস্তার বিবি (বেগম বিবি) ও বদরন্নেসার চরিত্র। গ্রন্থকার অনেক চরিত্রেরই একত্র সমাবেশ করিয়াছেন, কিন্তু সে গুলি তত পরিস্ফুট হয় নাই। এতদ্ব্যতীত যে দু একটা নরপিশাচ ও স্বদেশদ্রোহীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার কোন কোন স্থান আমাদের নিকট অপ্রীতিকর বোধ হইল। তিনি সুবল মিত্রের চরিত্র বর্ণন করিতে যাইয়া একস্থানে বলিয়াছেন, "সুবলের চরিত্র মন্দ ছিল না। তবে সে একটু গাঁজা খাইত, এবং যশোহরের লোকের কুসংসর্গে ছিল বলিয়া অল্প বয়সেই তাহার লাম্পট্য দোষ জন্মিয়াছিল।" এরূপ আর দুই একটী স্থান আছে। একটা

লোকের চরিত্র চিত্রিত করিতে যাইয়া একটা প্রদেশের উপর একপ গুরুতর দোষারোপ করা, আমরা অত্যন্ত অন্যায় ও রুচিবিগর্হিত মনে করি। গ্রন্থকার মহাশয় "অভিযাত" পরিবারের উপর বড চটা, তাই তাঁহাদের কাহার কাহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কুৎসা কীর্ত্তন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণ স্বদেশদ্রোহী অত্যাচারী ছিলেন, পরস্বাপহরণ করিয়া বড় মানুষ হইয়াছিলেন, এসকল কথার প্রমাণ আছে কিংবা থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহারা জারজ ছিলেন, ইহার প্রমাণ থাকিলেও বলা উচিত কিনা গভীর বিতর্কের বিষয়। তার পর চণ্ডী বাবুত অন্যান্য ঘটনার ন্যায় তাহার কোন প্রমাণই দেন নাই, অথচ কোন কোন পরিবারের উপর এত বড় একটা গুরুতর কলঙ্ক আরোপ করিয়া বসিলেন! এসকল দোষ আমরা গুরুতর দোষ বলিয়া মনে করি।

গ্রন্থকার একমাত্র "অভিযাত" পরিবারের উপর খড়্গ হস্ত নহেন, কায়স্থদিগের উপর তাঁহার বড়ই বিজাতীয় ঘৃণা। কায়স্থ শূদ্র যে বিভিন্ন নহে, ইহা বৈদ্যকুলোদ্ভব তাঁহার এবং তাঁহার "পিতৃ পিতামহের চিরন্তন সংস্কার!" তিনি এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কায়স্থ "ছিদাম ও জগন্নাথ" বিশ্বাসদ্বয়কে বাগ্দী সন্তান পর্য্যন্ত প্রমাণিত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, অথবা বাগ্দী সন্তানদ্বয়কে কায়স্থ বর্ণে উন্নীত করিয়াছেন! এই জগন্নাথের পুত্রই নাকি রাজা যাদবেন্দ্র হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশধরগণ নাকি আজও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তখন হিন্দু সমাজের বন্ধন এত দূর শিথিল ছিল যে, বাগ্দী কায়স্থ হইতে পারিত, একথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। হিন্দু-সমাজের এই বর্ত্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থায় শূদ্রগণ কায়স্থশ্রেণী ভুক্ত হইতেছে বটে; কিন্তু আজও কোন বাগ্দী কায়স্থ হওয়া দূরে থাক্, জলচল শূদ্রের বর্ণ হইতে পারিতেছে কিনা, গভীর সন্দেহের বিষয়। তাঁহার বইএ একপ একদেশদর্শী অনেক কথা আছে। সে যাহা হউক, এসব দোষ সত্ত্বেও আমরা একথা বলিতে পারি যে,আজ কালকার বাজারে রামু শ্যামুর লিখিত যে শ্রেণীর নাটক নভেল বাহির হইতেছে, "মহারাজা নন্দকুমার" সে শ্রেণীর নহে, তদপেক্ষা উন্নতর শ্রেণীর।

আমাদের আর একটী বক্তব্য এই, তিনি ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিক ঘটনা একপ ভাবে সংমিশ্রণ করিয়াছেন যে, কোন্‌টী প্রকৃত ঘটনা,

কোন্‌টী কাল্পনিক ঘটনা, তাহা সাধারণ পাঠকগণ নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারিবে কিনা, সন্দেহের বিষয়। পাছে ঐতিহাসিক ঘটনা গুলিও কাল্পনিক বলিয়া মাঠে মারা যায়, এই আমাদের আশঙ্কা।

গীতসূত্রসার—শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কৃষ্ণধন বাবু পুস্তক খানিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম ভাগে সংগীতের উপপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। এই পুস্তকের অনেক গুলি গুণ দেখিলাম, তন্মধ্যে ইহার গভীর গবেষণাপূর্ণতা, সুখপাঠ্যতা, প্রাঞ্জলতা ও আড়ম্বরশূন্যতাই অধিক প্রশংসনীয়। শ্রুতি সম্বন্ধে কৃষ্ণধন বাবুর কথাগুলি শুনিয়া আমরা বড়ই প্রীত হইয়াছি। হিন্দু সংগীতের বিশেষ গৌরবের বস্তু এই কারুকার্য্য গুলির উপর "গণিতক্ষেপ" করিতে গিয়া আমরাও কৃষ্ণধন বাবুর সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ছিলাম, কিন্তু দেশীয় সংগীত-তুম্বুরুগণের গোঁড়ামির ভয়ে তাহা প্রচার করিতে সাহস পাই নাই। এই পুস্তকে মূর্চ্ছনার যে নূতন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা অতীব যুক্তি সঙ্গত। কৃষ্ণধন বাবু যে স্বর লিপি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা কিঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য; কিন্তু তাহা একবার যিনি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে একথা স্বীকার করিবেন যে, ইংরাজি প্রচলিত পদ্ধতির পরেই এই প্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই স্বরলিপি দেখিয়া শিখিলে শিক্ষার্থীকে বাধ্য হইয়া, অজ্ঞাতসারে হইলেও তালজ্ঞানটা বিশেষ রূপে লাভ করিতে হইবে। এই স্বরলিপিতে তালের প্রত্যেক বিভাগের স্থানে এক একটী এক মাত্রার চিহ্ন পড়িয়া থাকে, এবং আগা গোড়া ড্রয়িং স্কেলের (Drawing scale) মতন করিয়া সময়টা পরিস্কার রূপে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। ইহাতে যে তাল শিক্ষার কত সুবিধা হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কৃষ্ণধন বাবু অতি কোমল, অতিকড়ি ইত্যাদি সুর এবং রাগ রাগিণীর সময় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অনেকেরই মতভেদ হইতে পারে। কিন্তু সময় সম্বন্ধে সকল ওস্তাদের মতটা ঠিক্ একরকম হয় না; সুতরাং এই দুইটী কথা কোন মতেই গীতসূত্রসারের দোষের মধ্যে ধরা যাইতে পারে না। কৃষ্ণধন বাবু এই পুস্তকে অনেককেই খোঁচা দিয়াছেন—অনেক বড় বড় রোগীকে বড়ি খাওয়াইয়াছেন; আশা করি ইহাতে উক্ত মহাত্মাগণের এবং দেশের কিছু উপকার হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড, অষ্টম সংখ্যা।]   [আশ্বিন, ১২৯৩।

আলোচনা

মাসিক পত্রিকা।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

সূচী।

কলিকাতা

পটলডাঙ্গা, ২নং বেনেটোলা লেন, সখা-যন্ত্রে, শ্রীললিতমোহন দাস-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রতি [illegible] মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

প্রতিমা।

সকল দেশে সকল লোকে প্রমিতার পূজা করে। অজ্ঞান জুলু ও জ্ঞানী স্পেন্সার সকলেই প্রতিমার উপাসক। প্রতিমা পূজা স্বাভাবিক। কল্পনায় মনুষ্যত্ব, ভাবশূন্য জীব নাই।—কাহারও ফুটে, কাহারও ফুটে না। কিন্তু এমন কেহ নাই, কি যেন গানের মত যাহার কাণের কাছে একেবারে বাজে না। ফুলের হারে কোনটী কলি, কোনটী ফুটন্ত ফুল।

ফুল লইয়া মানুষের চিরদিনের কারবার। ফুল দিয়া শিশু পুতুল সাজায়, কুমারী ফুল দিয়া বনদেবী সাজে, যুবতী সপত্র বেলের কলি বুকের উপর গুঁজিয়া রাখে, প্রাচীনা ফুলের হারে ও গঙ্গাজলে দেবতার পূজা করে। যদি ফুলভার নিদ্রার আবেশ সঞ্চার করে, মানুষের প্রাণটী ফুলের বাণী, শিশুর হাসি তাহার নিদর্শন। তাই মানুষ ফুলের এত সোহাগ করে, দেবতার পায় ফুলের অঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ হয়। ফুলের স্বপন কি মধুর। সে স্বপন যেন স্বপন না হয়। ধীরে ধীরে ফুলটী ছুঁইতে হয়; সে যে ফুলের ঘাও সহিতে পারে না। শীতল বায়ু ধীরে ধীরে তার হাতটী ধরিয়া তার সঙ্গে খেলা করে। তার প্রাণটী বড় কোমল, অতি কোমল লতিকার শিশিরের শীতল জলে নিশির শীতল ছায়ায় তাহার জন্ম। মধু লোভে চঞ্চল অলি চারিদিকে কত ছুটিয়া বেড়ায়, কুসুমের কাছে পৌঁছিলেই তার চঞ্চলতা দূর হয়, অতি ধীরে ধীরে সে ফুলের মুখ খানি চুম্বন করে, যেন তার ঘুমটী না ভাঙ্গে; সে এতই কোমল যে তার দিকে চাহিতে ভয় করে, পাছে আমার খর দৃষ্টির চাপে শুকাইয়া যায়,—আর না ফুটে। "চাহি বনা কুসুম পানে, চাহিব না আর; চাহিলে পরে শুকিয়ে যাবে, ফুটবে না সে আর।" সে যে হৃদয় মাত্র, হৃদয়ের প্রতিকৃতি ফুল। গঙ্গা পূজা করিতে গঙ্গাজল চাই। হৃদয়ের পূজা করিতে হইলে ফুল দিতে হয়, ফুল হৃদয়ের প্রতিনিধি, ফুল দিলে হৃদয় দেওয়া হয়,—শুধু ভাল বাসা নয়, শুধু স্নেহ নয়, শুধু ভক্তি নয়, সমস্ত হৃদয়টা, হৃদয়ের সবটা দেওয়া হয়। ভক্তির চেয়েও পবিত্র, ভালবাসার চেয়েও কোমল, আমার যুঁথী, জাতী, মালতী। ফুল ছাড়া পূজা, আর কাণু ছাড়া কীর্ত্তন, দুই ই প্রলাপ। কথা শুষ্ক, নিশ্বাসে গবলিত কথা দিয়া পূজা একটা উদ্ভট্ট রহস্য। হৃদয়ের

মধ্যে আশা যখন ঘোমটা দিয়া থাকে,—বড় কোমল, বড় পবিত্র, গলার শ্লেষ্মা, নিশ্বাসের ধূলি দাঁতের কঠোরতার মধ্য দিয়া কথা রূপে যখন বাহির হয়, তখন তাহার সতীত্ব ঘুচে, সে তখন বারবনিতা। বারবনিতা উপহার দিয়া দেবতার পূজা? এ কলিকালে, এ শুষ্ক অপবিত্র বিশ্বের মরুভূমে সকলই শোভা পায়।

হৃদি-ফুল হার দেবতার গলায় দিব। বর-মাল্য দিয়া তাঁহাকে বর সাজাইতে বড় সাধ হয়। দেবতা আমার মত। কল্পনা তাঁহাকে আমার মত করিয়াছে। জ্ঞান তাঁহাকে আমার হইতে দেয় না। জ্ঞান শুষ্ক, কল্পনা কোমল, কল্পনার কোয়াসায় আমি কত ছবি দেখি, সূর্য্যের কিরণে কত বিচিত্র বর্ণ প্রতিভাত হয়, কত শিশু ক্রীড়া করে। সে 'নিতুই নব'; কত তরঙ্গ ছুটে, আনন্দ ফুটে, বিষাদ টুটে। উচ্ছ্বাসের ফেণ-রাশি দিশি দিশি ধাওয়ে। গেঁটে ও সেক্সপিয়ার, যব ও ইসায়া, দান্তে বা পেটরার্ক, রাফেল বা ফিড়িয়াস, সাধ্য কি সে অপূর্ব্ব চিত্র তুলি-কায় চিত্রিত করিবে? সে অদ্ধস্ফুট মালা, তার অৰ্দ্ধেকটা জানা গিয়াছে। মুহূর্ত্ত-ফটোগ্রাফে সে চিত্র উঠে না। সে যে চুরি করে চাঁদ, চোখের চাহনিটীত ধরিতে পারি না। চোখে চোখে দেখা হইলে যে ছুটিয়া পলায়। ফটোগ্রাফে উঠিবে কি? ফুটুয়া ধরিবে কি? সে আধ-ফুট হাসি কল্পনার নিজস্ব ধন।

সে কোয়াসার কোমল কান্তি, ঊর্ণনাভের লুতাতন্তু জ্ঞান কঠোর অঙ্গুলি ঘাতে চূর্ণ করিয়া দেয়। শীতল ছায়া বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রচণ্ড মার্ত্ত-ণ্ডের দোর্দ্দণ্ড কিরণে মস্তক দগ্ধ করে। সে দীপ্তশিখার অভিষেক আর হয় না। আশার কোমলতা মরিয়া পড়ে, প্রবৃত্তির মোহ চলিয়া যায়, স্বপনের আবেশ ভাঙ্গিয়া যায়; একটা সহরের গোলমাল মাথায় ঢুকে, সাহারার আগুনে-বাতাসে প্রাণের প্রাণ যায়। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ঘুচিয়া যায়। মানুষ মরিয়া দেবতা হয়। দেবতা মরিয়া ভূত হয়। নিরা-কার।!। আকাশের মতও নহে, আকাশের প্রতিকৃতি সাগরের মতও নহে। বজ্রের মতও নহে, মৃত্যুর মতও নহে। নিরাকার।।! কেন আমাকে জ্ঞান দিয়াছিলে? সয়তান হইয়া আমাকে জ্ঞানের ফল কেন খাওয়াইয়াছিলে? অনন্ত পিয়াস মেটে না, বুক ফাটিয়া যায়। অনন্ত তুষানল নিবে না। পলে পলে অণুর পর অণু ঝলসিতেছে। অনন্ত

কালই অনন্ত নরক-যন্ত্রণা ভুগিতে হইবে। নাস্তিকতা বা আত্মহত্যা জ্ঞানের পরিণাম। কেন আমাকে জ্ঞান দিয়াছিলে? চিরদিন কেন শিশুর মতন রহিলাম না? আরত তেমন করিয়া তোমার কোলে বসিতে পারি না, মুখ খানি ধরিয়া চুম দিতে পারি না, চুল গুলি লইয়া খেলিতে পারি না। মা বলিয়া ডাকিতে পারি না। রাঙ্গা চরণ দুখানি ধরিয়া বুকে তুলিতে পারি না। মান অভিমান, হাসি তামাসা, ক্রীড়া কৌতুক, সব ফুরাইল। আর তুমি আমার হইবে না। জ্ঞান—জ্ঞান—জ্ঞান, মৃত সমুদ্রের পাশ ফল, যে জ্ঞান চায়, সে লউক, আমিত চাহি না। নিষ্ফল, নির্গুণ, কালা বোবা কাণা ভূত মুসলমানের মামদ, সন্ন্যাসীর নিবৃত্তি, সাংখ্যের পুরুষ, কণাদের শিলাকণা, তুমি নাস্তিকের স্কন্ধে চাপিয়া বস। আমি কল্পনাকে লইয়া দুদিন খেলিয়া লই। তোমাকে ফুলের মালার প্রতিমা সাজাইয়া মনুষ্যত্ব সার্থক করি। শিশুর সরলতা, অজ্ঞানতা, কল্পনা-প্রবণতা, ক্রীড়া-প্রিয়তা যেন জন্ম জন্ম আমার থাকে। এস একবার সোহাগ করি। আমি মনুষ্য, মনুষ্যত্বই আমার আদর্শ। দার্শনিকের কাছে তোমার দেবত্ব খাটাইও, আমার কাছে গৌর হয়ে এস, আমি তোমাকে বালভোগ খাওয়াইব, শোয়াইব, বসাইব। আদর করিব, অপমান করিব, কখন বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিব, আবার কখন হৃদি-সিংহাসনে বসাইব। তুমি আমার গরু চরাইবে, বাধা বহিবে, কখন গোবর্দ্ধন ধরিবে, কখন বাঁশী বাজাইবে। ধানের কনক শিরে দুলিবে, কমল বনে বীণার ঝঙ্কার দিবে, কখন করে অসি—গলে মুণ্ডমালা দিয়া আমার শত্রু শাসন করিবে। আমাকে পৌত্তলিক বলিয়া পণ্ডিতে উপহাস করুক সে ভাল, আমি নাস্তিক বলিয়া দার্শনিকের গৌরব আকাঙ্খা করি না।

তোমার নাকি হৃদয় নাই। আমার চোখের জল গুলি বালিতে শুকাইয়া যায়। আমার মর্ম্মভেদী করুণ বিলাপ বাতাসে উড়িয়া যায়। তোমার কান নাই শুনিবে কি? চোখ নাই দেখিবে কি? আমার প্রাণের অনন্ত পিপাসা, হৃদয়ের অতৃপ্ত বাসনা চিরদিন অতৃপ্ত রহিবে, বনফুল শুকাইয়া বনভূমে শুকাইয়া পড়িবে, কোমল লতিকা নিদাঘ-তাপে মাটীতে মাথা লুটাইবে। কারণ, তোমার হৃদয় নাই, আকাঙ্খা নাই, হৃদয়বানের সহিত সহানুভূতি নাই। আমি পরকালেও অবিশ্বাস

করিতে পারি কিন্তু মনুষ্যত্ব ঘুচাইতে পারি না। বরং আত্মহত্যা করিয়া একদিনে সকল যাতনা ঘুচাইতে পারি, কিন্তু সন্ন্যাসী হইয়া অনন্ত দিনের অনন্ত যাতনা সহিতে পারি না। হৃদয়ের বাসনা শুকাইতে হইবে, যে ছেলে গুলি যত্ন করিয়া বুকে পুষিয়া দীর্ঘকাল মানুষ করিয়াছি, চোখে দেখিয়া হাতে ধরিয়া তাহাদিগকে গলা টিপিয়া মারিতে হইবে, আর তাহারা আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিবে, একটা নিশ্বাসও ফেলিতে পারিবনা। তাহা হইলে নিবৃত্তি হইল কৈ?!!! এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিতে পারিবনা। তাহা হইলে নিষ্কাম হইল কৈ?!!! কাজ নাই ভাই তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম, তোমার নিবৃত্তি মার্গে, আমার গৃহস্থের সংসার ভাল। তোমার সন্ন্যাস, তোমার যোগ, তোমার সংযমন, তোমার থাক্; আমি মনুষ্যত্ব চাহিব। প্রবৃত্তির তরঙ্গের উপর হাত পা ছাড়িয়া বুক পাতিয়া সাঁতার দিব, কখন পর্ব্বতের চূড়ায় চড়িব, কখন অতল জলে ডুবিব। পর্ব্বতের আঘাতে কখন বক্ষ চূর্ণ হয় সেও ভাল, আমি নির্ব্বাত-নিষ্কম্প শুষ্ক নিরাপদতা চাহি না। শ্বাপদ সঙ্কুল বন ভূমি, শুষ্ক বালুময় নির্জ্জীব মরুভূমি অপেক্ষা প্রিয়তর। আমি কাপুরুষ নহি, সংযমন সন্ন্যাসকে ভয় করি না, আবশ্যক হইলে অকাতরে তোমার পায়ের উপর প্রাণটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে পারি, কিন্তু জ্ঞানের চাকচিক্যে প্রতারিত হইয়া সজ্ঞানে আত্মহত্যা কেন করিব? সাধ করিয়া পাগল হইব? যে মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ করে, সে আত্মঘাতী। যে দেবত্বের প্রয়াস করে, নরকে তাহার চিরবাস ঘটে। আপনার প্রকৃতি ও আপনার ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিও না,—গীতার এই মহান্ উপদেশ।

আমি জানি না তুমি দেবতা কি না। আমি বিশ্বাস করিতে পারি না, তুমি হৃদয় শূন্য। যদি তাহাই হও, সন্ন্যাসী, বাতুল ও উন্মাদের নিকট হইও। আমার নিকট চিরদিন হৃদয়বান্ মানব-প্রকৃতি হইয়া থাকিও। যদি না হও, আমি তোমাকে ছাড়িয়া মনুষ্যের পায়ে আত্ম সমর্পণ করিয়া মনুষ্যত্ব সার্থক করিব, উৎকট পিপাসার শান্তি করিব। আমার নূতন জন্ম, মনুষ্যত্বের পূর্ণতা পাইতে মনুষ্যই আমার উপযুক্ত আদর্শ। যদি আদর্শ মানব রূপে আমার চোখের সামনে দেখা দেও, তুমি আমার জন্ম সার্থক করিবে, আমার ইষ্ট গুরু হইবে। আর নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্ম্মম হইয়া সপ্তম স্বর্গে বসিয়া থাক, তোমার প্রতি-

মূর্ত্তি গড়িয়া তোমার ফটোগ্রাফ লইয়া তাহার সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করিব। মনুষ্যত্ব ঘুচিলে তখন তুমি কাছে আসিও। কেবল একটা অনুরোধ, প্রতিকৃতি যে তোমার অনুরূপ নহে, এইটা বুঝিতে দিও না।

দেবতা লইয়া আমি কি করিব? আমার মত যাহার আকার নহে, সে কদাকার, আমার মত যে সুন্দর নহে, সে কুরূপ, আমার মত যে কোমল নহে, সে পাষাণ, আমার মত যার হৃদয় নাই, সে রাক্ষস, তাহার সঙ্গে আমার সহানুভূতি নাই। সে আমার সখা হইবে কি রূপে? তাহার পায় বিকাইব কেন? হৃদয় তাহারে চাহে না। সে আমাকে তাহার করিতে চায়, সে আমাকে আমি যাহা চাই, তাই দিয়া ভুলাইবে। আমি মানুষ আদর্শ মানুষ চাই। দেবতা চাহি না, অবতার চাই। আর আমি যাহাকে চাই, তাহাকে না পাইলে অন্যকে—হোক না সে রূপবতী, হোক না সে গুণবতী তাহাকে——কেন ভাল বাসিব? তোমার সপ্তম রাজ্যের অতুল ধন তোমার থাক্, আমি তাহা চাহি না, তোমার স্বর্গের নন্দন-কানন তোমার থাক্, আমি তাহা চাহিনা। আমাকে এই শ্যামাঙ্গিনী তরুলতা-কুঞ্জকানন-শোভিনী পৃথিবী ভাল লাগে, এমন ঘাস পাতা, এমন ফুল ফল, এমন পশু পাখী, এমন নীলাকাশ, এমন চন্দ্রাতপ, আর এমন প্রিয়জন কি তোমার স্বর্গে আছে? আমায় তৃষ্ণায় জল দেয়, ব্যথায় হাত বুলায়, কাছে বসাইয়া সোহাগ করে,—— এমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, এমন অমৃত রাশি, এমন মনুষ্য কি তোমার স্বর্গে আছে? আমি মানুষ, আমি মানুষে মুগ্ধ, ভূত প্রেত দেব দানব চাহি না,——হইতে পারে তারা রূপবান্, কিন্তু রূপত আমার চোখে? আমার চোখ লইয়া দেখ দেখি, এরা সুন্দর কি তারা সুন্দর? আমার হৃদয়টা লইয়া দেখ দেখি, কিসে তৃপ্তি হয়?

মানুষের কাছে বসিলে আমার নেশা হয়। হেমন্তের শিশির কণার মত মদিরা-কণা আমার অজ্ঞাত সারে প্রাণটা ছাইয়া ফেলে। নেশায় বিভোর হই; যত পাই তত খাই, যত খাই তত চাই। পিপাসা মেটেনা— কেবল বলি, ঢাল ঢাল, আরো ঢাল, আরো আরো। এমনি যখন মাতাল হই, তখন আমাকে লইয়া তাহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। এ বড় সহজ উপায়। তাহার মত চোখ দুটী লইয়া, তেমনি মুখ খানি লইয়া আমার কাছে আসিও; তাহার পর আমি মাতাল হইলে, তোমার প্রাণ

দিয়া আমার প্রাণটা পূর্ণ হইলে যথা ইচ্ছা পঞ্চম বা সপ্তম, যে স্বর্গে ইচ্ছা লইয়া যাইও। প্রথমে সহানুভূতি দেখাইও, আমার দুর্ব্বলতায় একটু প্রশ্রয় দিও, তাহার পর ক্রমে ক্রমে শাসন করিও। ক্রম-বিকাশ না হইলে পূর্ণ-বিকাশ হইবে না, ফড়ুক্ করিয়া তুঙ্গ শৃঙ্গে উড়িয়া বসিলে চলিবে কেন? আমাকে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হইবে। মাথা বেড়িয়া নাক দেখাইতে হইবে। ধীরে ধীরে হাতটী নাড়িয়া ঘুমটী ভাঙ্গাও। আমি তোমা দ্বারা শাসিত হইতে চাই, তোমার অবাধ্য হইব না। শাসনের কাঠিন্যতা প্রথমতঃ একটু কোমল কর; আমি যে মনুষ্য, দেবত্বের পূর্ণ কঠোরতা আমাকে ত্রাসিত করে। হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে সঙ্গে লইয়া চল, আমার দুর্ব্বলতাকে উপহাস করিও না, তাহা হইলে চলিবে কেন? অনন্ত তরঙ্গঘাতে একটু টলিবে না, এমন হিমাচল হইলে চলিবে কেন? পাষাণের সঙ্গে কি ভাব হয়? যখন ধন চাহিব ধন দিবে, যশ চাহিব যশ দিবে, আয়ুঃ চাহিব আয়ুঃ দিবে। বালককে পুতুল দিয়াই ভুলাইতে হয়। পাথর রুচি তাহার রুচিবে কেন? যখন বড় হইব, তখন আপনিত পুতুল ছাড়িব; আর চাহিব না। শিশুকে পুথী দিয়া কি ভুলান যায়? যখন বড় হইব, তখন আশা উচ্চতর হইবে; তাই বলি যত দিন মানুষ থাকিব, মনুষ্যত্ব ভাল বাসিব, মানুষের প্রবৃত্তি, মানুষের হৃদয় দেখাইয়া আমাকে শাসন কর। যখন দেবতা হইব, তখন তোমার নিষ্কাম দেবত্বের প্রয়াসী হইতে পারি। ধর্ম্মের সার্থকতা জীবনে; যে ধর্ম্মে জীবন যায়, সে ধর্ম্ম লইয়া কি হইবে? তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম সাধন করিতে আমার মনুষ্যত্বের অবসান হইবে। তখন আমি আর আমি থাকিব না। আমি যদি না রহিলাম, আমার যদি মৃত্যু ঘটিল, তবে নিষ্কামতা কাহার লাভ হইবে? পরের জন্য আমার প্রাণটা দিব কেন? এমন কবিতা পূর্ণ জীবন, এ কি ছাড়া যায়? এখন আমার মালা ছড়াটী গলায় পর, হাসিয়া একবার সোহাগ কর। নিরাকারতা, নির্ব্বিকারতা, নিষ্কামতা, ঘট পটতা গিরি গুহায় ফেলিয়া দাও। মানুষে যেন খুঁজিয়া না পায়। সম্বর সম্বর, জ্ঞানের জ্যোতিটা একটু কমাইয়া বাঁধ, ঘরে একটু আলো-আঁধারে হউক, নতুবা ধাঁধা লাগিবে। মনুষ্যত্বের কাঁচা মাটীর উপর দেবত্বের প্রাসাদ টেকিবে না। কি একটা কিম্ভূত কিমাকার হইবে। বালক পুতুল চাহে, মানুষ প্রতিমা চাহে। জোর করিয়া আমার প্রতিমা চূর্ণ করিয়া

আমাকে হৃদয়হীন করিও না। হৃদয় আমার সর্ব্বস্ব। আর কিছু না থাকিলে, আমার এই হৃদয়টী তোমাকে দিতে পারিব; এই হৃদয়ের উপর তোমার পদাঙ্ক আছে। ইহা পবিত্র স্থান, দেবমন্দির। চণ্ডাল না হইলে কি মন্দির ভাঙ্গিতে আর কেহ সাহস করে? সব ছাড়িতে পারি, হৃদয় ছাড়িতে পারি না, কারণ, উহাই আমার মনুষ্যত্বের উপাদান। হৃদয় বড়, না জ্ঞান বড়? হৃদয় বড়। জ্ঞানে দেবতা, হৃদয়ে মনুষ্য। মানুষের কাছে মানুষ বড়, দেবতার কাছে দেবতা বড়। সিংহ শৃগালের আদর্শ নহে, ব্যাঘ্র হরিণের আদর্শ নহে, দেবতা মানুষের আদর্শ নহে, মানুষের আদর্শ মানুষ। আদর্শ যত উচ্চ হইবে, উন্নতি তত অধিক হইবে, সেই জন্য আমার আদর্শ দেব-নর বা নর-দেব। দেবতা মানব রূপ ধারণ না করিলে, মানবীয় আকার মানবীয় ব্যবহার, মানবের ন্যায় শোক দুঃখ জন্ম জরা জীবন মৃত্যুর অধীন না হইলে, আজ মানব সমাজ কোথায় থাকিত? প্রতিমা পূজা কেবল স্বাভাবিক নহে, উহা মানব সমাজের স্থায়িত্ব ও উন্নতির মূল হইয়াছে; প্রতিমা পূজা করিয়াই লোকে দেবতাকে পাইয়াছে। প্রতিমা না থাকিলে ঈশ্বর থাকিত না, এবং এমন দিন হইবে না, যখন প্রতিমাকে অতিক্রম করিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে ভাব শূন্য জীবন শূন্য দেবতা মানব সমাজে রাজত্ব করিবে। যেখানে ভাব নাই, সেখানে জীবন নাই, জল শূন্য নদী, উচ্ছ্বাস শূন্য জল আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক। যে দেবতাকে হৃদয় শূন্য করিতে চাহে, সে দেবতাকে মারিতে চাহে। আমার দেবতা জীবন্ত মানব প্রকৃতি সম্পন্ন। আমার সঙ্গে কাঁদেন, আমার সঙ্গে হাসেন। তিনি জীবন্ত প্রতিমা; তাঁহাকে বুকে বুকে রাখি, চরণ ধরিয়া কাঁদি। আমার দেবতা প্রতিমা, আমার পূজা কবিতা। ফুলের দেবতা, ফুল দিয়া পূজা, ফুলের সৌরভে জগৎ পরিপূর্ণ। কল্পনায় আবাহন, কল্পনায় বিসর্জ্জন। প্রতিমা পূজা মধুর কবিতা। পুরোহিত সকলেই সুদক্ষ;——হোমর, যব, ইস্কাইলাস, ইসায়া, দান্তে, রাবিলে, কালিদাস ও সেক্সপিয়র। প্রতিমা দর্শন ফুলের ঘ্রাণ ও কাব্য পাঠ জগতের উৎকৃষ্ট পূজা। কবিতা ফুল ও প্রতিমা-- অপূর্ব্ব সম্মিলন! "তথা গয়া গঙ্গা বারাণসী, সকল তীর্থ মিলে আসি, প্রভাস প্রয়াগ ও বরাঙ্গ পদতলে।"

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

কাউণ্ট ডিএল ভিএলা ও ব্রাহ্মসমাজ।

কাউণ্ট গব্লেট্ ডিএলা ভিএলা ব্রাসেল্‌স নগরের বিশ্ব বিদ্যালয়ের ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক। ইতি পূর্ব্বে তিনি বেলজিয়াম দেশের প্রতিনিধি সভার সভ্য ছিলেন। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে তিনি ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি কোন প্রচলিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ে সংযুক্ত নহেন, কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসায় নিযুক্ত সেই সকল লোকের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। অনেক বৎসর হইতে ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতবর্ষে ধর্ম্ম সংস্কারের যে সমস্ত চেষ্টা হইতেছে, তিনি তাহা অধ্যয়ন করিতেছেন। সেই আলোচনা ও অধ্যয়নের ফল স্বরূপ তিনি একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থ খানির নাম "Contemporary Evolution of Religious thought in England, America and India" অর্থাৎ ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ভারতবর্ষে ধর্ম্ম চিন্তার সমকালীন ক্রম বিকাশ। এই গ্রন্থে তিনি একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে প্রাগুক্ত স্থানত্রয়ে যে সমস্ত আন্দোলন হইতেছে তদ্বিবরণ সন্নিবেশ করিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে স্বীয় অভিপ্রায়ও সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই বিবিধ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটীকে শ্রেষ্ঠ বা অপরকে হীনকল্প জ্ঞান করেন না। তিনি বলেন "এই সমস্ত সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য বিষয়ে একতা এরূপ প্রবল বলিয়া বোধ হয় যে, তাহাদের বাহ্যিক লক্ষণ বিষয়ে বিভিন্নতা গণনার মধ্যেই আসে না।" তিনি যে অত্যন্ত উদার সার্ব্বভৌমিক মত অবলম্বন করেন, তাহা স্বীকার করিতে তিনি কুণ্ঠিত নহেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, "ইংলণ্ডে ডাক্তার মার্টিনোর নিকট আমি আপনাকে ইউনিটেরিয়ন, মিষ্টার ভয়সির নিকট একেশ্বরবাদী, বোষ্টন নগরে থিওডোরপার্কারের নিকট ট্রেনসেণ্ডেণ্টেলিষ্ট, নিউবর্কোর্টে মিষ্টার পটারের নিকট প্রকৃতি উপাসক, নিউইয়র্ক নগরে আডলার সাহেবের নিকট খৃষ্টকে মনুষ্য জ্ঞান, এবং কলিকাতা নগরে ব্রাহ্মদিগের নিকট ব্রাহ্ম সদৃশ জ্ঞান করিতে কুণ্ঠিত নহি। যদি আমি উপরোক্ত সম্প্রদায়ের কোন একটীতে জন্ম গ্রহণ করিতাম, সম্ভবতঃ আমি তাহার মধ্যেই

থাকিতাম, সেহেতু তদ্দ্বারা আমার নৈতিক ও মানসিক উন্নতির কোন বিঘ্ন উৎপাদিত হইত না।"

গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিষয় লিখিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ যে জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী হয় না, কিন্তু যাহারা কেবল শুষ্ক ধর্ম্মমত লইয়া তর্ক বিতর্ক করে তাহাদেরই পক্ষে উহা গ্রহণীয়, এই আপত্তি যে অমূলক কাউণ্টডিএলভিয়েলা ভারতবর্ষে আসিয়া তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে তিনি প্রথমে ব্রাহ্ম সমাজ দর্শন করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে যদি খৃষ্ট ধর্ম্মের বাহ্যিক চিহ্ন ক্রুশাদির অভাব না থাকিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মদিগকে কোন খৃষ্টীয় উপাসক মণ্ডলী বলিয়া তাঁহার ভ্রম হইত। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দির দর্শন করিয়া তাঁহার মনে যে ভাব উদয় হইয়াছিল, তাহা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—"১৮৭৬ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসের শেষ রবিবারে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট দিয়া গমন করিতে করিতে আমি এক প্রকার নূতন গথিক আকারের উপাসনালয়ে প্রবেশ করিলাম। তথায় তিন চারি শত ব্যক্তি শুভ্র লম্বমান শাল দ্বারা আবৃত হইয়া উপবিষ্ট ছিল। প্রাচীন কালে গ্রীক জাতি টোগা পরিধান করিলে যে রূপ দেখাইত এই তাম্রবর্ণ বাঙ্গালীরা শুভ্র বসনাবৃত হইয়া সেইরূপ শোভা ধারণকরিয়াছিল। তন্মধ্যে দ্বাদশাধিক স্ত্রীলোক দৃষ্ট হইল না এবং ইহারা মন্দিরের এক পার্শ্বে বসিয়াছিল। কিন্তু গেলারির পর্দ্দার অন্তরাল হইতে যে শব্দ আসিতে ছিল, তদ্দ্বারা বোধ হয় উপাসক মণ্ডলীতে কেবল পুরুষ জাতিই নহে। দ্বারের সম্মুখেই বেদী, ঐ মার্ব্বেল নির্ম্মিত উচ্চ আসনে আচার্য্য শুভ্র বসনাবৃত এবং আসনপিড়ে হইয়া বসিয়া আছেন।"

যাঁহারা কখন ভারতবর্ষে আসেন নাই, এদেশের বসন ভূষণ, উপবেশনাদি তাঁহাদের চক্ষে অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু কেহ কেহ যেমন পূর্ব্বে এই সমস্তকে অসভ্যতার লক্ষণ বলিতেন, এখন আর সেরূপ নাই। দূরদর্শী পণ্ডিতগণ আমাদের আচার ব্যবহারে সরলতা ও বসন ভূষণাদিতে প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন নিরীক্ষণ করেন। আমরা অনেক সময়ে ঐ অদূরদর্শী লোকদিগের ন্যায় স্বদেশীয় বসন ভূষণকে অসভ্যতার পরিচায়ক বলিতে শিখিতেছি। কাউণ্ট গবলেট যে সামান্য উড়নী দেখিয়া "flowing showls" বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন, আমরা যথার্থ শালকে এখন অসভ্যতার চিহ্ন মনে করি। এ অপ্রাসঙ্গিক বিষয় এখন থাকুক।

ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে একেশ্বরবাদ কিরূপে প্রচলিত হইয়াছিল, হিন্দু ধর্ম্ম উদারভাবে কিরূপে সেশ্বর নিরীশ্বর, দেশীয় বিদেশীয় সকল প্রকার ধর্ম্ম ও দর্শনের মত স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত হইতে দিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিস্তারের বিবরণ গ্রন্থকার অতি বিশদ রূপে স্বীয় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন। তিনি "ব্রাহ্মধর্ম্ম" শব্দের এই রূপ অনুবাদ করিয়াছেন "Rule of theism"। এস্থলে বলা আবশ্যক, যে গ্রন্থখানি আমরা পাঠ করিতেছি ইহা অনুবাদ মাত্র। প্রকৃত গ্রন্থ ফরাসিস্ ভাষায় লিখিত, সুতরাং এই অনুবাদ গ্রন্থকারের না হইতে পারে, ইহা অনুবাদকের ভ্রম হওয়াও অসম্ভব নহে।

রাজা রামমোহন রায় কিরূপে একেশ্বরবাদী হইলেন, তাঁহার ধর্ম্মানুসন্ধানের প্রথম ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থকার একস্থলে লিখিয়াছেন যে, "তিনি বেদান্ত হইতে ঈশ্বরের একত্ব ও পরকালের অস্তিত্ব শিক্ষা করিয়া ছিলেন। সেই জন্য তাঁহাকে একেশ্বরবাদী বলা যায় না।" কাউণ্ট ডিএল ভিয়েলার সংস্কার এই যে, রামমোহন রায় অদ্বৈতবাদী ছিলেন। কিন্তু তিনি যদি রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন, তাহা হইলে এই ভ্রমে পতিত হইতেন না।

গ্রন্থকার আর একটী ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল একটী বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত মাত্র ছিল। তাঁহার এপ্রকার বলিবার অভিপ্রায় এই যে, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়ে ব্রাহ্মগণ পৌত্তলিকতার সংস্রব পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা গৃহে সমস্ত পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিতেন এবং ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। তখন তাঁহাদের বিশ্বাস এরূপ প্রগাঢ় হয় নাই, যদ্দ্বারা ত্যাগ স্বীকারে প্রবৃত্ত হইতে পারা যায়। যদি কেবল এই সামাজিক ক্রিয়া কলাপে ধর্ম্মবলের অভাব হেতু ব্রাহ্মধর্ম্মকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত জ্ঞান করা যায়, তাহা হইলে এখনো ব্রাহ্মধর্ম্মকে ধর্ম্মনামের উপযুক্ত বলা যাইতে পারে না। সহস্র ব্রাহ্মের মধ্যে কয় ব্যক্তি সামাজিক বিষয়ে ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয় লইয়াছেন? শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিজ্ঞানের সীমা হইতে যে উন্নত করিয়াছিলেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। রাজা রামমোহন রায়ের সময় ধর্ম্মবিজ্ঞান

লইয়া ব্রাহ্মগণ সন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম রূপে পরিণত হয়। তিনি ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে ব্রাহ্মদিগকে একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভুক্ত করিবার জন্য ধর্ম্ম গ্রহণ প্রতিজ্ঞা প্রণয়ন করেন এবং তদবধি ব্রাহ্মগণ একটী সম্প্রদায়ে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহার সময়ে প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রগাঢ় ঈশ্বর প্রেম, জীবন্ত বিশ্বাস এবং বিশুদ্ধ জীবন ব্রাহ্মদিগের আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল। স্বতন্ত্র ধর্ম্মের যে কয়েকটী উপকরণ আবশ্যক, তাহা তিনি ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ করিলেন। যথা,—ধর্ম্মগ্রন্থ, উপাসনা-প্রণালী, বীজমন্ত্র, অনুষ্ঠান পদ্ধতি ও ধর্ম্ম গ্রহণ প্রতিজ্ঞা। অপৌত্তলিক উপাসনা এবং গৃহানুষ্ঠানও তিনি সর্ব্ব প্রথমে প্রচার করেন। তাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম গ্রহণ প্রতিজ্ঞার প্রথম প্রতিজ্ঞা ত্রয় এই,—

১। সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল দাতা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, মঙ্গল স্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাহার প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।

২। পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না।

৩। রোগ বা কোন বিপদ দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।

তিনি কেবল নিয়ম ও প্রণালী প্রণয়ন করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। আপনার জীবনে তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি পৌত্তলিক উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার গৃহে কোন দেব দেবীর পূজা হইত না, প্রতিদিন পারিবারিক ব্রহ্মোপাসনা হইত। সামাজিক অনুষ্ঠান বিষয়েরও তিনি প্রথম দৃষ্টান্ত দেখান। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে তাঁহার কন্যার বিবাহ নিজ প্রণীত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার গৃহে কোন পৌত্তলিক অনুষ্ঠান হয় না।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন ইহার পূর্ব্বে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রবোচনায় এই সামাজিক অনুষ্ঠান সকল ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তিত হয়; কিন্তু ১৮৪৪ খৃঃ অব্দেয় যখন পৌত্তলিক জা পূ নিষিদ্ধ হয়, তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ

করেন নাই। ঐ প্রতিজ্ঞা যে ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি তাহাতে কোন সংশয় হইতে পারে না। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিশুদ্ধ অপৌত্তলিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। রাজা রামমোহন রায়ের সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকৃতরূপে সংস্থাপিত হয় নাই। তিনি সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল, কুসংস্কার বর্জ্জিত লোকদিগকে লইয়া সার্ব্বভৌমিক উপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন, কিন্তু ঐ উপাসকগণ গৃহে সকল প্রকার কুসংস্কার ও পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিতেন। কিন্তু রামমোহন রায় নিজে কুসংস্কার বর্জ্জিত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় অদ্ভুত জ্ঞান সম্পন্ন ও উদার-চিত্ত ব্যক্তি যে পৌত্তলিকতাকে বাল ক্রীড়া স্বরূপ মনে করিতেন, তাহা তাঁহার বেদান্তের অনুবাদ, ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার প্রভৃতি গ্রন্থ দ্বারা নিঃসংশয়িত রূপে প্রমাণিত হইতেছে। তাঁহার প্রথম সংস্কারের সময় বিচার ও আলোচনার সময়, পুরাতন কুসংস্কার বিনাশের সময়। তিনি নূতন কিছু গঠন করিবার অবকাশ পান নাই। কিন্তু যাহা কিছু তিনি করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতে পারে যে, ইংলণ্ড হইতে যদি তিনি প্রত্যাগমন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে গঠন কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

সাধের মেয়ে।

(১)

সাধের মেয়ে, আদর পেয়ে,
হেসে কুটি কুটি ;
মায়ের কাছে, সদাই নাচে,
তুলি হাত দুটী।

(২)

পবনে উড়ে, বদনে পড়ে
কুঞ্চিত কুন্তল,
তাহার মাঝে, মধুর সাজে
নয়ন যুগল।

(৩)

নাকের কোলে, নোলক দোলে,
মাধুরী বিকাশ ;
হাসির ঘায়, কাঁপিয়া যায়
সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বাস।

(৪)

সোহাগে গলে, টলিয়া চলে,
পাগল পরাণ ;
চকিত চায়, কখন গায়
ভাঙ্গা ভাঙ্গা গান।

(৫)

অঠিক সব, সঙ্গীত নব,
আধ আধ স্বব ;
স্থধুই হাসে, স্বপন ভাষে
ভরিয়া অন্তর।

(৬)

ভোরের বেলা, ঊষার খেলা
হেরিলে নয়নে,
বাগানে গিয়া, কুসুম নিয়া,
খেলে এক মনে।

(৭)

মাযেব স্বব, শুনিলে পর,
আনন্দ লহবি
তুলিয়া, ধায়, চঞ্চল পায়,
গৃহ আলো করি।

(৮)

সকল ঘরে, আঁচল ধরে
ভ্রমে মার সাথ,
পড়িয়া উঠে, আবার ছুটে,
নাহি দৃষ্টি পাত।

(৯)

সাঁঝের করে, কনক সরে,
ডুবিলে তপন ;
গরবী মেয়ে, বাবারে পেয়ে,
চুমাতে মগন।

(১০)

গলায় ছুলি, জগৎ ভুলি,
খেলাব কাহিনী,
পিতার কাণে, ভগন তানে
ঢালে, সোহাগিনী।

(১১)

রজনী হেবে, জননী তাবে,
পিতৃ-কোল হতে,
লইযা সুখে, চুমিয়া মুখে,
চাহে ঘুমাইতে।

(১২)

আহ্লাদ ভরে, শয্যার ক্রোড়ে,
বালিকা-রতন,
স্নেহের সনে, পুলক মনে,
ঘুমায় তখন।

শ্রীমতী নীহারিকা।

বিবেক বা হিতাহিত জ্ঞান।

বিবেক কি, মানবের ধর্ম্মজীবন গঠনের জন্য তাহার কার্য্যই বা কি, ইহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণ করা গেল। বিষয়টি এত কঠিন, মানবজীবনে ইহার ফলাফল এতদূর গুরুতর যে, এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে ভয় হয়, পাছে কেহ ভিতে বিপরীত বুঝেন। কিন্তু সত্যই পরম মঙ্গল, সত্যাপেক্ষা কাম্য বস্তু কিছুই নাই। তাই সত্যের নামে আজ এই গুরুতর বিষয়টির আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

বিবেক কি? এ বিষয়ে নানা প্রকার মতভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেহ বা বিবেককে অতি সামান্য স্থান প্রদান করিয়াছেন, ইহাকে বাল্য শিক্ষার ফলমাত্র বিবেচনা করেন, ও কুসংস্কার জনিত ভয়ই ইহার প্রাণ মনে করেন। অন্যপক্ষে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা বিবেককে মানবের বৃত্তি সমূহের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াও তৃপ্ত নহেন, তাঁহারা ইহাকে মানবীয় বৃত্তিই বলিতে চাহেন না—ইহাকে মানব হৃদয়ে ঈশ্বরের সাক্ষাৎবাণী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বিবেকের উৎপত্তি সম্বন্ধে এতদুভয় শ্রেণীস্থ লোকই অতি সহজে মীমাংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু উভয়ই প্রমাণ-সাপেক্ষ। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণের মতে শিক্ষাই সর্ব্বশক্তিমান— যেরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, চরিত্র ও মত ঠিক তদনুরূপই হইবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অনেক স্থলে আমরা ইহার বিপরীত দেখিতে পাই। অনেকে অসৎ সংসর্গে পড়িয়াও স্বীয় মৌলিক চরিত্র গুণে তৎসমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চরিত্র-মহিমা বিস্তার করিয়াছেন। অপর পক্ষে অনেকে সৎ সঙ্গে থাকিয়াও এবং সৎশিক্ষা পাইয়াও সময় ও সুবিধা উপস্থিত হইলেই স্বীয় চরিত্রের মালিন্য দেখাইয়া সাধু সঙ্গের মহিমা হ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। দর্শনের সাহায্যে এ বিষয়টির বিচার করিলেও ইহার ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করা অতি সহজ। এই শ্রেণীর লোকেরা বিবেকের মূল অন্তরে নির্দ্দেশ না করিয়া সম্পূর্ণ রূপে বাহিরের শিক্ষার উপর স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু "যাহা নাই ভাণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।" যাহা আমার অন্তরে নাই,

তাহার অস্তিত্ব আমার বাহিরেও নাই—থাকিলেও তাহা আমার নিকট অসৎ। শিক্ষার কথা বলিতে গেলেই শিক্ষাগ্রহণোপযোগী কিছু আমার অন্তরে থাকাও নিতান্ত প্রয়োজন—যাহা আমার অন্তরে বীজরূপে বর্ত্তমান আছে, শিক্ষা আমাকে তাহা দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। শিক্ষাবলে জন্মান্ধের বর্ণ-জ্ঞান জন্মাইয়া দেওয়া যায় না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের মতে মানবের ভাল মন্দ বুঝিবার কোন ক্ষমতা নাই—তাই ঈশ্বর কৃপা করিয়া মানবকে এই ভ্রম প্রমাদ ও পাপ পূর্ণ সংসারে পাপের পথ ত্যাগ করিয়া পুণ্যের পথে বিচরণ করিবার জন্য একটি বিশেষ শক্তি দিয়াছেন—সেই শক্তি মানবের অন্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া সর্ব্বদাই তাহাকে সদসৎ বিচার করিয়া দিতেছে। মানব সেই বাণীর প্রতি কর্ণপাত করে না বলিয়াই পাপে পতিত হয়, আর যদি সে সেই বাণীর আদেশ শ্রবণ করিয়া চলিতে বাসনা করে, তাহা হইলে সে অভ্রান্ত ভাবে পুণ্যের পথে চলিতে সক্ষম হইবে। এই মতের প্রতিকূলে সাংঘাতিক আপত্তি আছে। মানবের যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই ঈশ্বর প্রদত্ত, সে-ভাবে হিতাহিত জ্ঞানের শক্তিও ঈশ্বর প্রদত্ত। কিন্তু ইহাতে যে বিশেষত্ব প্রদান করা হয়—সে বিশেষত্বের প্রমাণ কি? মানবের অন্যান্য বৃত্তি সমূহ মানব প্রকৃতির অঙ্গীভূত, কিন্তু এই বিবেক বৃত্তি যে ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাদত্ত, ইহার কোনও সাক্ষৎ প্রমাণ নাই। বোধ হয় কেহ এরূপ প্রমাণ দিতে সাহসাও হইবেন না। তবে যদি এরূপ প্রমাণিত হয় যে, মানবের অন্যান্য জ্ঞান-বৃত্তি ভ্রম প্রমাদ সঙ্কুল, কিন্তু বিবেকের বাণী অভ্রান্ত (আর যদি ইহা ঈশ্বরের বাণীই হয়, তাহা হইলে অভ্রান্ত না হইয়াই পারে না, কারণ, ঈশ্বরে ভ্রম প্রমাদ স্পর্শ করিতে পারে না), তাহা হইলেও বিবেকের বিশেষত্ব অনুমান সিদ্ধ। বিবেক যদি ঈশ্বরের বাণী হয়, তাহা হইলে ইহা দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে বিভিন্ন হইতে পারে না। ঈশ্বর নিত্য সত্য, তাঁহার আদেশও নিত্য সত্য হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বিবেকের আদেশ অভ্রান্ত নহে—দেশ, কাল, পাত্র ভেদে ইহা ভিন্নরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহা একজনের নিকট সত্য, তাহা অপরের নিকট অসত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এমন কি একই ব্যক্তিকে যাহা এক সময়ে পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছে, অন্য সময়ে তাহাই আবার মহা অসত্য বলিয়া ত্যাগ করিতে দেখা যায়। প্রত্যেক

ব্যক্তির জীবনের এরূপ উদাহরণ ভূরি ভূরি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ভ্রম সংকুল বিবেককে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ বাণী বলিয়া গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন না। যদি কেহ করেন, তবে তাঁহার সহিত যুক্তি তর্ক নিষ্প্রয়োজন।

এই দুই প্রকার সম্পূর্ণ বিরোধী মতের মধ্যবর্ত্তী নানা প্রকার মত রহিয়াছে। এখন একে একে তাহাদেরই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা বিবেককে সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বরের বাণী বলিয়া স্বীকার করেন না ও ইহার বিশেষ বিশেষ আদেশকে অভ্রান্ত মনে করেন না বটে, কিন্তু ইহাকে বুদ্ধি বৃত্তির উপরে স্থান প্রদান করিয়া থাকেন ও ইহার আদেশে একটা বিশেষ পবিত্রতার (Sanctity) ভাব আরোপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাক্য মনে না করিলেও ইহাকে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন ও ইহার আদেশ লঙ্ঘন করাকে ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘনের ন্যায় মহা পাপ বলিয়া মনে করেন। বিশেষ বিশেষ কার্য্যে এই বৃত্তির ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হইলেও এবং শিক্ষাভেদে ও অবস্থা ভেদে ইহার পরিবর্ত্তন হইলেও তাঁহারা ইহাতে কিছু ঐশী ভাব আরোপ করিতে পরাঙ্মুখ হন না, অথচ স্পষ্টরূপে ইহাকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অভ্রান্ত বাণী বলিতেও কুণ্ঠিত হন। অন্যপক্ষে যদিও স্বীকার করেন যে, বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালনা ও পরিশুদ্ধির উপর এই বৃত্তির বিকাশ ও উজ্জ্বলতা নির্ভর করিতেছে, তথাপি ইহাকে বুদ্ধি বৃত্তির সংস্কার বিশেষ বলিতেও প্রস্তুত নহেন। ইঁহারা মনে করেন যে, বিশেষ বিশেষ কার্য্যে বুদ্ধি বৃত্তিই ভাল মন্দ বিচার করিয়া দেয় ও বিবেক বৃত্তি বুদ্ধির সেই বিচারে কিঞ্চিৎ পবিত্রতা (Sanctity) কিঞ্চিৎ অবশ্য কর্ত্তব্যতার ভাব ঢালিয়া দিয়া ইহাকে অতি মানবীয় করিয়া তুলে। বিবেকের বিশেষ বিশেষ আদেশে বুদ্ধির বিচারাংশটুকু ভ্রান্তি মূলক হইতে পারে, কিন্তু বিবেকের ভাবাংশটুকুর পরিবর্ত্তন নাই—এইরূপে বিবেকের অভ্রান্ততা কতক পরিমাণে দণ্ডায়মান করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইঁহাদের বিবেক সম্বন্ধে মতামত নিতান্ত অস্পষ্ট—একটু সন্দেহ সমাচ্ছন্ন। ইঁহারা বুদ্ধিবৃত্তির মস্তকে পদস্থাপন পূর্ব্বক ইহাকে সম্পূর্ণরূপে অতি মানবীয় করিতে প্রস্তুত নহেন, অথচ ইহাকে সম্পূর্ণরূপে মানবীয় বৃত্তি বলিয়া ইহার বিশেষ ঐশিক পবিত্রতা নষ্ট করিতেও সাহসী হন না,—পাছে লোকে

বিবেকের বন্ধন ছিন্ন করিয়া উচ্ছৃঙ্খলমার্গে বিচরণ করে। ইঁহারা এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া দার্শনিক সঙ্গতি (Philosophic consistency) রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। যাঁহারা বিবেককে বুদ্ধিবৃত্তি নিরপেক্ষ একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ও ইহাতে ঐশ্বরিক ভাব আরোপ করেন, তাঁহাদের দেখান উচিত যে ইহার স্বতন্ত্র সত্তা আছে। বিশেষ বিশেষ কার্য্যে আমরা প্রধানতঃ বুদ্ধির কার্য্যই দেখিয়া থাকি। একটি কার্য্য উপস্থিত হইলে বুদ্ধি তাহার সকল দিক দেখিয়া ভালমন্দ স্থির করিয়া দিল। এপর্য্যন্ত বিবেকের কার্য্য নহে, বুদ্ধিরই কার্য্য। যাহাকে ভাল বলিয়া স্থির হইল তাহাই করিতে আমাদের প্রাণ স্বভাবতঃই উন্মুখ হয়—তদনুযায়ী কার্য্য করিলে আমরা আত্ম-প্রসাদ লাভ করি, তদ্বিপরীত করিলে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। এখানেই আমরা বিবেকের কার্য্য দেখিতেছি। এখন যাঁহার বুদ্ধির এই ভালমন্দ বিচার যত সুস্পষ্ট বা যাহার এই বিচার যত কিন্তু-রহিত, তাহার প্রাণেই বিবেকের আধিপত্য সেই পরিমাণে সমধিক, তাহার প্রাণে আত্ম প্রসাদ বা আত্ম গ্লানির তীব্রতা সেই অনুপাতে বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু যাহার বুদ্ধি ম্লান, যাঁহার ভাল মন্দ বিচার অস্পষ্ট বা যাহার বিচারিত বিষয়ের উভয় পক্ষই ভালমন্দ মিশ্রিত, নিরবচ্ছিন্ন ভাল বা নিরবচ্ছিন্ন মন্দ কোনও দিকেই নাই—তাঁহার পক্ষে বিবেকজ আত্মপ্রসাদ বা আত্মগ্লানি সেই পরিমাণে তীব্র হইতে পারে না। এই বিষয়টা একটু অনুধাবন করিয়া চিন্তা করিলে ইহা স্পষ্টই দেখা যাইবে, যে বুদ্ধির উজ্জ্বলতার উপর বিবেকের উজ্জ্বলতা নির্ভর করে, একের হ্রাস বৃদ্ধিতে অপরের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই Concomitant variation দ্বারা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, বিবেক বুদ্ধিবৃত্তিরই অংশ বিশেষ।

কেবল যে ভাল মন্দের গুণ গত বিচারে আমরা বুদ্ধির কার্য্য দেখিতে পাই, তাহা নহে—ভাল মন্দের পরিমাণ গত বিচারে বুদ্ধির কার্য্য আমরা আরও সুস্পষ্ট রূপে দেখিতে পাই। যে স্থলে বিচারিত বিষয়ের একদিকে নিরবচ্ছিন্ন ভাল, অপর দিকে নিরবচ্ছিন্ন মন্দ অর্থাৎ যে স্থলে বুদ্ধির বিচার সুস্পষ্ট ও কিন্তু-রহিত সে স্থলে বিবেকের আদেশও সুস্পষ্ট ও কিন্তু-রহিত ; কিন্তু যে স্থলে বিচারিত বিষয়ের উভয় দিকই ভালমন্দ মিশ্রিত, ভালর সহিত মন্দটুকু মিশিয়া রহিয়াছে, সত্যের সহিত অসত্য মিশিয়া রহিয়াছে—সে স্থলে বিবেক সন্দেহে দোলায়মান—কোনও দিকেই সুস্পষ্ট

আদেশ দিতে পারিতেছেন না, তখন বিবেককে রায় দেওয়া স্থগিত রাখিয়া ভালমন্দের পরিমাণ গত বিচারের জন্য পুনরায় বুদ্ধির নিকট যাইয়া উপস্থিত হইতে হয়। বুদ্ধি তখন ভাল মন্দর পরিমাণগত বিচার আরম্ভ করিলেন। উভয় দিকের ভাল ও মন্দ যদি এক জাতীয় হয়, তবে কোন দিকে কতটুকু ভাল ও কোন্ দিকে কতটুকু মন্দ, বিচার করিয়া স্থির করিলেন, কিন্তু যদি উভয় দিকের ভাল ও উভয় দিকের মন্দ ভিন্ন জাতীয় হয়, তবে বিভিন্ন জাতীয় ভালের আবার মূল্য নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক হইয়া উঠে—কোন্ ভালতে কতটুক লাভ, কোন্ মন্দে কতটুকু ক্ষতি গণনা করা প্রয়োজন। এখন ভাল আর ভাল বলিয়াই ভাল নহে, মন্দ আর মন্দ বলিয়াই মন্দ নহে—ভালমন্দ এখন ক্ষতি লাভ গণনাতে পরিণত হইল। এই ক্ষতিলাভ গণনায় ভালমন্দর বস্তুগত পার্থক্য (Eternal distinction) নষ্ট হইল, ভাল মন্দর বিশেষ পবিত্রতা (Sanctity) ও বিশেষ অবনতি (Degradation) সরিয়া গেল। আর এই ক্ষতিলাভ গণনাই বা কি? একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, ইহা মানবের সুখ দুঃখ গণনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভাল মন্দ বিচার এখন সুখ দুঃখ গণনায় পরিণত হইল, শেষ কালে হিতবাদ (Utilitarianism) এর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। এরূপ জটিল বিষয়ে বিবেকের রায় বুদ্ধির এই পরিমাণ গত বিচারের অনুযায়ী—যে দিকে মন্দ অপেক্ষা ভালর ভাগ অর্থাৎ দুঃখ অপেক্ষা সুখের ভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক, বিবেকও সেই দিকে রায় দেন—কিন্তু এ রায় নিঃসংশয় নহে। এরূপ জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় একটু কিন্তু থাকিয়াই যায়।

হয়ত কেহ কেহ ভাল মন্দর পরিমাণ গত বিচারেই আপত্তি করিবেন। তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে, ভাল ভাল-বলিয়াই ভাল, মন্দ মন্দ-বলিয়াই মন্দ। তাহার আবার তারতম্য কি? যাহা ভাল তাহা সর্ব্বথা গ্রহণীয়, যাহা মন্দ তাহা সর্ব্বথা পরিহার্য্য। ভাল মন্দ বিচারে ক্ষতিলাভ গণনাকে তাঁহারা হয়ত অত্যন্ত নীচ কার্য্য মনে করিবেন, (Utilitarianism) কে তাঁহারা হয় ত (Pig philosophy) নামে অভিহিত করিবেন। আচ্ছা দেখা যাউক, তাঁহাদের মত গ্রহণ করিলে বিবেকের অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়? যে প্রশ্নের উভয় দিকই ভালমন্দ মিশ্রিত, সে প্রশ্নে বিবেক কোন্ দিকে রায় দিবে? উভয় দিকেই ভাল আছে; সুতরাং উভয় দিকই বিবেকের

নিকট গ্রহণীয; উভয় দিকেই মন্দ আছে, সুতবাং উভয দিকই পবিহার্য্য। আব সকল ভাল সকল মন্দই ইঁহাদেব মতে তুল্য মূল্য। সুতবাং এরূপ জটিল প্রশ্নে বিবেক মূক। তবে হয ত কেহ কেহ এরূপ ভালমন্দেব বিমিশ্রণই সম্ভবপব মনে কবেন না—তাঁহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা নিষ্প্রযোজন।

আমি এপর্য্যন্ত বুদ্ধিব বিচাব ও বিবেকেব আদেশকে দুইটি বিভিন্ন কার্য্য বলিযা বর্ণনা কবিযাছি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাবা দুইটি পৃথক কার্য্য নহে—একই কার্য্যের দুটি পার্শ্ব। একটি কার্য্য ভাল বলিযা স্থিব হওযা ও তাহা কাম্য, এ দুইই এক কথা। যাহা কিছু যাঁহাব নিকট ভাল, তাহাই তাঁহাব কাম্য; আব যাহা কিছু যাঁহাব কাম্য, তাহাই তাঁহাব নিকট ভাল বলিযা প্রতীযমান হয। কাম্য বস্তুব প্রাপ্তিতে সুখ, অপ্রাপ্তিতে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। যদি সেই কাম্য বস্তুব প্রাপ্তিব জন্য আমাদের উচ্চতব বৃত্তিব পবিচালন হইযা থাকে, তাহা হইলে সেই সুখ আত্মপ্রসাদেব আকাব ধাবণ করে; কিন্তু যদি আমাদেব উচ্চতর বৃত্তিব পবিচালনেব অভাবে বা কোন নিম্নতব বৃত্তিব পবিচালন দ্বাবা সেই কাম্যবস্তু আমাদের হস্তান্তব হইযা থাকে, তাহা হইলেই আমাদেব আত্মগ্লানি উপস্থিত হয। আর যদি অন্যরূপ কার্য্য কবিবার ক্ষমতা স্বত্বেও আমবা এরূপ কবিযা থাকি, তাহা হইলে সে আত্মগ্লানিব সীমা পবিসীমা থাকে না। বিচারেব ভ্রম বশতঃ যদি আমবা মন্দকেই ভাল বোধে কার্য্যে পবিণত কবিয়া থাকি ও পবে ভ্রম বুঝিতে পাবি, তবে যাহা সামান্য ক্ষোভেব আকাব ধারণ কবিত তাহাই জ্ঞানকৃত হইলে অর্থাৎ মন্দকে মন্দ জানিয়াও কার্য্যে পবিণত কবিলে আত্মগ্লানি রূপে পরিণত হয। একটু চিন্তা করিযা দেখিলে বুদ্ধির কার্য্য ও বিবেকের কার্য্য পৃথক নহে—একই, তবে অবস্থা ভেদ মাত্র। কাম্যকে ও ভালকে আমি একই বলিযা বর্ণনা করিয়াছি। কেহ হয় ত প্রবৃত্তি নিবৃত্তিব নামে ইহাব প্রতিবাদ কবিবেন। হয় ত বলিবেন—কাম্য ও ভাল এক না হইয়া ববং তদ্বিপবীত। কাম্য প্রবৃত্তি রূপে ও ভাল বা বিবেকের আদেশ নিবৃত্তিরূপে আমাদেব মধ্যে প্রকাশিত। কাম্য বা প্রবৃত্তি আমাদিগকে নরকের পথে লওয়াইতেছে, কিন্তু নিবৃত্তি বা বিবেক আমাদিগকে স্বর্গেব অভিমুখে টানিতেছে। আমাদেব কামনা স্বভাবতঃই নিম্নাভিমুখী, পাপই তাহার লক্ষ্য,

বিবেক নিবৃত্তি রূপে সর্ব্বদাই আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করিতেছে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পরস্পর বিরোধী, তন্মধ্যে প্রবৃত্তি আমি ও নিবৃত্তি আমি-নহি অর্থাৎ বিবেক বা ঈশ্বরের বাণী। একটু তলাইয়া দেখিলেই এই আপত্তির অসারতা অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকে পাপ ও পুণ্যের সহিত এক করাতেই এই মহা ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। ইঁহারা আমাদের কামনাকে প্রবৃত্তির সহিত ও কাম্যকে পাপের সহিত এক করিয়া মানব প্রকৃতির অবমাননা করিয়া থাকেন। মানব প্রকৃতি স্বভাবতঃই পাপ-প্রবণ নহে। ইহা যেমন পাপপ্রবণ, তেমনই পুণ্যপ্রবণ: মানব প্রকৃতিতে পাপ যেমন স্বাভাবিক, পুণ্যও তেমনই স্বাভাবিক। একজন পাপীর পক্ষে পাপ কার্য্য যেমন সহজ, একজন পুণ্যবানের পক্ষে পুণ্যকার্য্য করাও তেমনই সহজ। মানব প্রকৃতি ভালমন্দে মিশ্রিত— প্রবৃত্তি যেমন মানব প্রকৃতি প্রসূত, নিবৃত্তি তেমনই মানব প্রকৃতি প্রসূত। আর একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই প্রবৃত্তি নিবৃত্তির মধ্যে প্রকৃতি গত পার্থক্যও সরিয়া যাইবে—ইহারা প্রকৃতপক্ষে একই বস্তু—উভয়ই কামনা। প্রবৃত্তি নিবৃত্তির পার্থক্য বস্তুগত নহে—অবস্থাগত। নিবৃত্তি দূরদর্শী, কিন্তু প্রবৃত্তি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্ধ।—আপাত সুখে মত্ত বলিয়া প্রবৃত্তি ভবিষ্যৎ দর্শনে অক্ষম। আমরা যখন আপাত সুখের আশায় কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে যাই, তখন বুদ্ধি সেই কার্য্যের ফলাফল বিচার করিতে থাকে—বুদ্ধির বিচারে যদি ঠিক হয় যে, সে কার্য্যের অনুষ্ঠানে ভাবীফল দুঃখময় হইবে অথবা বর্ত্তমান সুখ হইতে নিবৃত্তি হইলে ভবিষ্যতে অধিকতর সুখের সম্ভাবনা, তাহা হইলে বুদ্ধি আমাদিগকে সে কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দেয়: তাহাই আমাদের নিকট নিবৃত্তি বা বিবেক রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোন কার্য্যের ফলাফল বা সুখ দুঃখরূপী ক্ষতি লাভ গণনার ফল বিবেক রূপে পরিণত হয়। আমরা এ বিচারেও দেখিতে পাই যে, বিবেক বুদ্ধিবৃত্তিরই অবস্থাভেদ বই আর কিছুই নহে। একটি দার্শনিক ভ্রান্তিতে ভ্রান্ত হইয়া কেহ কেহ প্রবৃত্তি নিবৃত্তির মধ্যে দুই ব্যক্তির বাক্য শুনিতে পান। সেই দুই ব্যক্তি কদাপি এক ব্যক্তি হইতে পারে না; সুতরাং তন্মধ্যে একজন আমি বা জীবাত্মা অন্যতর জীবাত্মায় ঈশ্বরের বাণী। কিন্তু বস্তুতঃই কি ইহা দুই পৃথক ব্যক্তির বাণী, না একই ব্যক্তির দুইটি ছায়া?

নিবৰলম্ব আমি বা অস্মিতা কখনও আমাদেব চিন্তা বা বিচাবেব বিষয় হইতে পাবে না—আমবা কখনই তাহাব স্বরূপ জ্ঞানেব বিষয় কবিতে পাবি না বা সেই নিবৰলম্ব 'আমিকে”ধবিতে পাবি না। যখনই আমবা অস্মিতাকে জ্ঞানেব বিষয কবিতে চাহি, তখনই তাহাব নিবৰলম্বত্ব নষ্ট হইযা যায, তখনই এক ভাঙ্গিয়া দুই হইয়া যায়—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয রূপে প্রকাশ হইযা পড়ে। এইরূপে আমবা যখনই যে কার্য্যে ব্যাপৃত হই—সেই সেই কার্য্যেব সহিত একটা কবিযা আমিব প্রতিবিম্ব মিশিযা থাকে, এক ভাঙ্গিযা শত আমি হইযা পডে। ভগ্ন দর্পণ খণ্ড সমূহে আত্মমুখ দর্শনেব ন্যায আমবা তখন প্রত্যেক কার্য্যে একটা কবিযা পৃথক আমি দেখিতে পাই—আমাদেব দৃষ্টিভ্রম উপস্থিত হয। তাই আমবা প্রবৃত্তি নিবৃত্তিব মধ্যে একই ব্যক্তির কার্য্য না দেখিযা দুই ব্যক্তিব কার্য্য দেখিতে পাই ও এই বিষয়ে ভ্রান্তিজালে জড়িত হই।

এই শ্রেণীব বিবেকবাদীদেব মতে বিশেষ বিশেষ কার্য্যেব ভালমন্দ বিচাবেব জন্য বুদ্ধিই দায়ী, কিন্তু সেই বিচাবানুসাবে মন্দ ত্যগ কবিযা ভাল কার্য্য কবা বা না কবাব জন্য দায়ী বিবেক। ইঁহাদিগকে মতেব সঙ্গতি (Consistency) বক্ষা কবিতে হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকাব কবিতে হইবে যে,কোন কার্য্যে বিশেষ দোষ বা গুণ কিছুই নাই—তবে মনেব যে ভাব হইতে সেই, কার্য্যটি অনুষ্ঠিত হয়, তদ্দ্বাবাই ইহাব সদসদত্ব বিবেচিত হয়। যদি বুদ্ধি ভ্রান্তি বশতঃ অত্যন্ত অসৎ কার্য্যকেও অর্থাৎ সাধাবণতঃ যাহাকে অসৎ বলে সৎ বলিযা সিদ্ধান্ত কবে ও তদনুসাবে কার্য্যটি অনুষ্ঠিত হয়,তবে তাহা কেবল বুদ্ধিব ভ্রম বলিয়াই পবিগণিত হইবে. কিন্তু তজ্জন্য কোন নৈতিকদোষ বা পাপ আত্মাকে স্পর্শ কবিবে না। অপব পক্ষে যদি কেহ কোন সৎকার্য্যকেও (অর্থাৎ যাহাকে সাধাবণতঃ সৎকার্য্য বলে) অসৎ কার্য্য জ্ঞানে অনুষ্ঠান কবে, তবে তাহাকে পাপেব ভাগী হইতে হইবে। ইহাঁদিগকে আরও স্বীকাব কবিতে হইবে যে, কেহ কোন পাপকার্য্যেব অর্থাৎ বিবেক বিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান কবিযাছে কিনা, তাহার বিচাবেব ভাব তাহাব নিজেব হাতে, অপবেব সে বিষযে বিচাব কবিবাব কোন অধিকার বা উপায নাই। যদি সে অসৎ বুঝিয়াও কোনও কার্য্যেব অনুষ্ঠান করিয়া থাকে,তবে তাহার প্রাণে আত্মগ্লানি উপস্থিত না হইয়াই পাবে না এবং যাহাব এই সদসৎ বিচাব যত সুস্পষ্ট তাহার প্রাণে সেই পরিমাণে অধিক আত্মগ্লানি

উপস্থিত হইবে। অন্য কথায় যে ব্যক্তি যত বিবেক বিরুদ্ধ কার্য্য করিল অর্থাৎ যে যত পাপী, তাহার আত্মগ্লানিও তত অধিক। এই যুক্তিটিকে অন্য দিক হইতে দেখিলে ইহা বলাই যুক্তি সঙ্গত যে, যাহার আত্মগ্লানি যত কম, সে তত কম বিবেক বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছে অর্থাৎ সে তত কম পাপী। আমরা দেখিতে পাই যে যাঁহাদের চরিত্র নির্ম্মল, সদসৎ জ্ঞান পরিমার্জ্জিত, একটু সামান্য বিবেক বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে তাঁহাদের আর আত্মগ্লানির সীমা পরিসীমা থাকে না। অপর পক্ষে যাহাদের সদসদ্ বিচার মলিন, যাহারা পাপে চিরাভ্যস্ত, তাহাদের প্রাণে গুরুতর পাপানুষ্ঠান করিলেও আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় না। যুক্তি পরম্পরায় অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করিতে হইলে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, শেষোক্ত শ্রেণীর লোকই অধিকতর পুণ্যবান ও প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকই অধিকতর পাপী। আমরা যে যুক্তি মার্গানুসরণ করিয়াছি, তাহাতে এই সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবী।

তবে আমাদের এই অপসিদ্ধান্তের কারণ কি? আমরা যে শ্রেণীর বিবেকবাদীগণের মত লইয়া বিচার করিতেছি, তাঁহারা কার্য্যকে এক প্রকার ফলাফল বিবর্জ্জিত করিয়া কেবল কর্ত্তার মানসিক ভাবকেই সর্ব্বস্ব বলেন। তাঁহাদের এই একদেশদর্শনের জন্যই এই যুক্তি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কার্য্য ফলাফল বিবর্জ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, কার্য্যের ফলাফল গুরুতর—কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীসীতানাথ নন্দী।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংগ্রাম স্থল।

কিছু দিন গত হইল, কোন একটী রেলওয়ে ষ্টেসনে একজন জর্ম্মণ দেশীয় লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব পণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁহাকে সংস্কৃত এবং অন্যান্য ভাষায় শিক্ষিত বলিয়া বোধ হইল। ইনি পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া নানা ধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য স্বদেশ হইতে বহির্গত হইয়াছেন। আমার সহিত যখন ইহাঁর সাক্ষাৎ হয়, তখন ইনি বেনারস গমন করিতেছিলেন। কিছু ক্ষণ কথোপকথনের পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি বোধ হয়, ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশ পর্য্যটন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন কয়েকটী ভিন্ন আমি ইয়োরোপ খণ্ডের প্রায় সকল দেশেই বেড়াইয়াছি। আমি তখন বলিলাম, তবে আপনি বলুন দেখি বর্ত্তমান সময়ে ইয়োরোপের ধর্ম্মভাব কিরূপ? তিনি বলিলেন প্রায় সর্ব্বত্রই সংশয়বাদ এবং অবিশ্বাসের প্রভাব প্রবল। ধর্ম্মের জন্য যে লোকের তত একটা পিপাসা (earnestness) আছে, তাহা বোধ হয় না। তথাকার ধর্ম্ম এখন একরূপ eat, drink and be merry অর্থাৎ খাও, দাও, আনন্দ কর। আমি বলিলাম আপনি বলিতে পারেন, এরূপ হওয়ার কারণ কি? তিনি উত্তর করিলেন, জড়বাদের (Materialism) বহুল প্রচারই ইহার এক মাত্র কারণ। আমার সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হইল। আমিও ইতি পূর্ব্বে এ বিষয়ের এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম। বাস্তবিক, এই যে ইয়োরোপীয় সভ্যতা, ইহা অন্তঃসারশূন্য প্রাণহীন সভ্যতা মাত্র। কে বলে ইংলণ্ড। তুমি সভ্যদেশ, কে বলে ফ্রান্স তুমি সভ্য? প্রকৃত সভ্যতার আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়া, তোমরা ঘোরান্ধকারের মধ্যে পতিত রহিয়াছ। বহির্বিষয়ের উন্নতি বিধান এবং এই ক্ষণভঙ্গুর শরীরের শোভা ও পারিপাট্য সাধনই যে সভ্যতার প্রাণ, সে সভ্যতা, সভ্যতা নামের কলঙ্ক মাত্র। যে জাতি বলে (comforts and convenience of life) জীবনের সাচ্ছন্দ্য এবং সুবিধাই, মানব জীবনের সারসম্পত্তি এবং লক্ষ্য, সে জাতি সভ্যতার স্বর্গীয় নিকেতন হইতে এখনও বহুশত যোজন দূরে পড়িয়া রহিয়াছে।

মানব জাতির স্বাধীনতাহরণ যে জাতির নিত্যব্রত, এবং সকল অনর্থ এবং অধোগতির কারণস্বরূপ পরাধীনতার লৌহময়ী শৃঙ্খল কোটি কোটি নর নারীর কণ্ঠে চিরজীবনের জন্য পরাইয়া দিতে পারিলেই যাহারা আপনাদিগকে ক্ষমতাপন্ন এবং গৌরবান্বিত মনে করে, ইহা নিশ্চয় যে, সে জাতি এখনও অসভ্যতার গভীরকূপে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। যদি পরমেশ্বরের রাজ্যে প্রথম শ্রেণীর অপরাধী কোন জাতি থাকে, তবে সেই জাতি, যাহারা মনুষ্যকে স্বাধীনতাধন হইতে বঞ্চিত করে। একবার ইয়োরোপ খণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, শোণিতলিপ্সু উন্মত্ত শার্দ্দূল যেমন এক স্থানে বসিয়া অরণ্যপ্রান্তে দৃষ্টি যোজনা করিয়া দেখে, কোন্ স্থানে কোন্ শিকারের বস্তু আছে, ঠিক সেইরূপ শার্দ্দূলস্বভাব ইয়োরোপীয় নরপতিবর্গ সিংহাসনে আসীন হইয়া লোলুপ নয়নে পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছে, কবে কোন্ রাজ্য হরণ করিব, কবে কোন্ জাতিকে দাসত্বনিগড়ে আবদ্ধ করিব। আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, (free love) স্বাধীন প্রণয় রূপ বিষবৃক্ষ যে সভ্যতার ভূমিতে উৎপন্ন হয়, তাহা কি বর্ব্বরতা অপেক্ষাও হেয় এবং জঘন্য নয়? যে সভ্যতা মানবের অন্তরের নিকৃষ্ট ভাব সকলকে খর্ব্ব করিয়া দেবভাব সকলকে জাগ্রত না করে, যে সভ্যতা আপনাকে ভুলিয়া, স্বার্থপরতাকে বিসর্জ্জন দিয়া, মনুষ্যকে নর নারীর সেবার জন্য প্রবৃত্ত না করে, যে সভ্যতা মানব হৃদয়ের পশুত্ব বিমোচন করিয়া তাহার মনুষ্যত্ব বিধান না করে, কিন্তু আকিঞ্চিৎকর শরীরের শোভা এবং সৌন্দর্য্য বিধানের জন্য, অতর্পনীয় বিলাসলালসা পরিতৃপ্তির জন্য এবং ভোগসুখে বিষয়ামোদে মত্ত থাকিবার নিমিত্ত, যে সভ্যতা মনুষ্যকে প্রণোদিত এবং উত্তেজিত করে, ধিক্ ধিক্ সে সভ্যতা, তাহা অচিরে মানবরাজ্য হইতে বিলুপ্ত হউক। বর্ত্তমান সময় ইয়োরোপ খণ্ডে যে নাস্তিকতা এবং অবিশ্বাসের প্রভাব এত দূর প্রবল, তাহার কারণ এই অন্তঃসারশূন্য বহির্ম্মুখীন সভ্যতার বহুল প্রচার, এই সভ্যতা মনুষ্যের দৃষ্টিকে অন্তর হইতে বহির্দ্দিকে লইয়া যায়, সুতরাং মনুষ্য অন্তর্দৃষ্টি বিহীন হইয়া পড়ে। হৃদয় মনের অবস্থা তোমার যেরূপ থাকে থাক, তুমি তোমার বাহিরের শোভা এবং সচ্ছন্দতা বিধানের জন্য প্রস্তুত হও, ইহাই এই সভ্যতার উচ্চ উপদেশ। এই সভ্যতা দ্বারা আরও সামাজিক বিবিধ প্রকার দুর্দ্দশা উপস্থিত হইতেছে। ভীষণ দরিদ্রতা, মানব অন্তরের নীচ

স্বার্থপরতা এবং চতুরতা, এই সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী ফল। এসকল বিষয় অদ্য আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

আমরা দেখিতেছি এই বাহ্যিক চাক্যচিক্‌শালী অসার পাশ্চাত্য সভ্যতা-স্রোত বর্ত্তমান সময়ে ভারত ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের দেশে শিক্ষিত দলের মধ্যে যে, অল্পে অল্পে অবিশ্বাস এবং নাস্তিকতার প্রভাব দেখা দিয়াছে, তাহার কারণ এই পাশ্চাত্য সভ্যতার আবির্ভাব। এক দিকে এই, অপর দিকে ঠিক ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন আর একটী স্রোত আসিয়া আমাদের সমক্ষে উপনীত হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি ভূমি পুরাতন হিন্দু ঋষিদিগের চিন্তা এবং উপদেশ, হিন্দু শাস্ত্র—বেদ বেদান্ত। দুই দিক হইতে দুই প্রকাণ্ড প্রবাহ আসিয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত, ভারত ভূমিই এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংগ্রাম স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই, ভারতবর্ষ ইহার কোন্‌টীকে গ্রহণ করিবেন? ইহার একটী অপরটীর সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রাচ্য সভ্যতা বলিতেছে, মায়ামযমিদমখিলং হিত্বা। এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড মায়াময়, এ জগতের যাহা কিছু দেখিতেছ সমস্তই ভ্রম, সর্পেতে যেমন রজ্জুভ্রম হয়, শুক্তিকাতে যেমন রজতভ্রম হয়, সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড ভ্রম মাত্র, বিশ্বচরাচর আর কিছুই নহে, অবিদ্যামায়া-বিজৃম্ভণ মাত্র। হে মনুষ্য! এই তোমার দেহ, এই যে তোমার জীবন, ইহা নলিনীদলগতজলবত্তরলং অর্থাৎ পদ্মপর্ণস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় এই আছে এই নাই। অতএব এই সকলের উন্নতির জন্য প্রবৃত্ত হওয়া অর্ব্বাচীনতা—মূঢ়তা মাত্র। হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি পরিচ্ছেদে এই উপদেশ, এই শিক্ষা। কি মহাভারত কি গীতা কি সাংখ্য কি পাতঞ্জল সকলেই সমস্বরে মনুষ্যকে শিক্ষা দিতেছে—জগৎ মিথ্যা, এই বিষয় সম্পদ আত্মীয় স্ত্রী-পুত্র সমস্তই মিথ্যা, অতএব এ সকলের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিও না। এই ভাব এদেশীয় লোকের ভিতরে এরূপ দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে যে, একজন অশিক্ষিত বর্ব্বর কৃষকের নিকট গিয়া প্রচার কর যে, এই জগৎ মিথ্যা এই পুত্র ধন জন এ সকলই মায়া; সে ব্যক্তি ইহার প্রতিকথায় সম্মতি দান করিবে, ঐ সকল কথা তাহার হৃদয়ের সহিত মিলিবে। কারণ, এই ভাবে সে উৎপন্ন, এই ভাবে সে শিক্ষিত, এই ভাব সে ব্যক্তির বংশগত, সংস্কারগত। প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার মূলমন্ত্র এই নিত্য-শাশ্বত অমর যে তোমার আত্মা, হে মনুষ্য